জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত

সাহিত্য কণিকা

অষ্টম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক
অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
ড. শোয়াইব জিবরান
শামীম জাহান আহসান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল, দক্ষ ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতিগঠন সম্ভব নয়। এই প্রত্যয় ও প্রণোদনা থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণীত হয়। উক্ত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে নতুন এক জীবনাকাঙ্ক্ষা ও জীবন-বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে প্রণীত এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে অষ্টম শ্রেণির **সাহিত্য কণিকা** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তকটির প্রতিটি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতিচেতনা, নারী-পুরুষের সমমর্যাদা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাকার তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবার সুযোগ পায়। সুস্থ চিন্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে অনিবার্যভাবেই সংকলিত রচনাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রচনা সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত করতে হয়েছে। এছাড়া জাতীয় প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রচুর পাঠের ভার থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে স্বল্প ও সুন্দর আয়োজনের মধ্যে তাদের আনন্দিত বিচরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে ও সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে অনুশীলনের জন্য নমুনা হিসেবে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং তারা অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে এবং যেকোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবে। এছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনোপযোগী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য বিচিত্র কাজের আয়োজন রাখা হয়েছে। **কর্ম-অনুশীলন** শীর্ষক অংশে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে। বানানের ক্ষেত্রে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে - যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তবে সময়–স্বল্পতার কারণে এবারে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটানো না গেলেও আশা করছি পরবর্তী সংস্করণে তা সম্ভব হবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও কর্ম–অনুশীলন প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ আবুল কাসেম মিয়া
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	গদ্য		
১.	অতিথির স্মৃতি	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	০১
২.	বাঙালির বাংলা	কাজী নজরুল ইসলাম	০৬
৩.	পড়ে পাওয়া	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
৪.	তৈলচিত্রের ভূত	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০
৫.	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	শেখ মুজিবুর রহমান	২৮
৬.	আমাদের লোকশিল্প	কামরুল হাসান	৩৪
৭.	সুখী মানুষ	মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ	৪১
৮.	শিল্পকলার নানা দিক	মুস্তাফা মনোয়ার	৪৮
৯.	মংডুর পথে	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	৫৩
১০.	বাংলা নববর্ষ	শামসুজ্জামান খান	৫৯
১১.	বাংলা ভাষার জন্মকথা	হুমায়ুন আজাদ	৬৫
	কবিতা		
১	মানবধর্ম	লালন শাহ্	৭০
২.	বঙ্গভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৭৪
৩.	দুই বিঘা জমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৮
৪.	পাছে লোকে কিছু বলে	কামিনী রায়	৮৫
৫.	নারী	কাজী নজরুল ইসলাম	৮৯
৬.	আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ	৯৩
৭.	দেশ	জসীমউদ্‌দীন	৯৭
৮.	নদীর স্বপ্ন	বুদ্ধদেব বসু	১০১
৯.	জাগো তবে অরণ্য কন্যারা	সুফিয়া কামাল	১০৫
১০.	প্রার্থী	সুকান্ত ভট্টাচার্য	১০৯
১১.	একুশের গান	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	১১৩
	পরিশিষ্ট		
১.	কর্ম-অনুশীলন		১১৭
২.	সৃজনশীল প্রশ্ন : কিছু কথা		১১৮

অতিথির স্মৃতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে এসেছিলাম বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। বায়ু পরিবর্তনে সাধারণত যা হয়, সেও লোকে জানে, আবার আসেও। আমিও এসেছি। প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে থাকি। রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙা একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করে, ঘুম ভেঙে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে-পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি—পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থ গাছের মাথায়—সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হতো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া, বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত। প্রাচীরের ধারের ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেত। হঠাৎ কি জানি কেন দিন-দুই এলো না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, কেউ ধরলে না তো? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই, পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা-কিন্তু তিন দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হলো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।

এমনি করে সকাল কাটে। বিকালে গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসি। নিজের সামর্থ্য নেই বেড়াবার, যাদের আছে তাদের প্রতি চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখতাম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ঢের বেশি। প্রথমেই যেত পা ফুলো ফুলো অল্পবয়সী একদল মেয়ে। বুঝতাম এরা বেরিবেরির আসামি। ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন। মোজা পরার দিন নয়, গরম পড়েছে, তবু দেখি কারও পায়ে আঁট করে মোজা পরা। কেউ বা দেখলাম মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরেছে—সেটা পথ চলার বিঘ্ন, তবু, কৌতূহলী লোকচক্ষু থেকে তারা বিকৃতিটা আড়াল রাখতে চায়। আর সবচেয়ে দুঃখ হতো আমার একটি দরিদ্র ঘরের মেয়েকে দেখে। সে একলা যেত। সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন নেই, শুধু তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। বয়স বোধকরি চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু দেহ যেমন শীর্ণ, মুখ তেমনি পাণ্ডুর—কোথাও যেন এতটুকু রক্ত নেই। শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবার, তবু সবচেয়ে ছোট ছেলেটি তার কোলে। সে তো আর হাঁটতে পারে না—অথচ, ফিরে আসবারও ঠাঁই নেই ? কি ক্লান্তই না মেয়েটির চোখের চাহনি।

সেদিন সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে, দেখি জনকয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা হরণের কর্তব্যটা সমাধা করে যথাশক্তি দ্রুতপদেই বাসায় ফিরছেন। সম্ভবত এরা বাতব্যাধিগ্রস্ত, সন্ধ্যার পূর্বেই এদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হলো, ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পেছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পেছনে চলেছে। বললাম, কী রে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি। সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। বুঝলাম সে রাজি আছে। বললাম, তবে আয় আমার সঙ্গে। পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার

বয়স হয়েছে; কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তিসামর্থ্য ছিল। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল, কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হলো, গেট বন্ধ করে দিতে চাইলে, বললাম, না, খোলাই থাক। যদি আসে, ওকে খেতে দিস। ঘণ্টাখানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসে নি—কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন?

জবাবে সে মুখপানে চেয়ে তেমনি ল্যাজ নাড়তে লাগল। বললাম, আজ তুই খেয়ে যাবি,—না খেয়ে যাসনে বুঝলি? প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়লে—অর্থ বোধ হয় এই যে, সত্যি বলছো তো?

রাত্রে চাকর এসে জানালে সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দার নিচে উঠানে বসে আছে। বামুনঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।

পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যায় নি। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।

আমি জানতাম, প্রত্যহ খাবার তো অনেক ফেলা যায়, এতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়তি খাবারের যে প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালির মালিনী—এ আমি জানতাম না। তার বয়স কম, দেখতে ভালো এবং খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ত। চাকরদের দরদ তার পরেই বেশি। অতএব, আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসি, দেখি অতিথি আগে থেকেই বসে আছে ধুলোয়। বেড়াতে বার হলে সে হয় পথের সঙ্গী; জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ অতিথি, আজ মাংস রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে? হাড়গুলো চিবোতে লাগল কেমন? সে জবাব দেয় ল্যাজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তা হলে ওর ভালোই লেগেছে। জানিনে যে মালির বউ তারে মেরেধরে বার করে দিয়েছে—বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না, তাই ও সুমুখের পথের ধারে বসে কাটায়। আমার চাকরদেরও তাতে সায় ছিল।

হঠাৎ শরীরটা খারাপ হলো, দিন-দুই নিচে নামতে পারলাম না। দুপুরবেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে, খবরের কাগজটা যেইমাত্র পড়া হয়ে গেছে, জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম। সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর তাদের বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায় নি, তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়। সে এলো না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম—খাওয়া হয়েছে তো রে? কী খেলি আজ?

হঠাৎ মনে হলো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কী একটা নালিশ ও জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ রে, কুকুরটাকে আজ খেতে দিয়েছিস?

আজ্ঞে না। মালি-বৌ ওরে তাড়িয়ে দিয়েছে যে।

আজ তো অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হলো কী?

মালি-বৌ চেঁচেপুঁচে নিয়ে গেছে।

আমার অতিথিকে ডেকে আনা হলো, আবার সে বারান্দার নিচে উঠানের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিলে। মালি-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকাল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হলো যে।

শরীর সারলো না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়ল। তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে। আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হলো, দুপুরে ট্রেন। গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়াল, মালপত্র বোঝাই দেওয়া চলল। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগল, কোথাও যেন কিছু

খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করলে। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কিরে, এখানেও এসেছিস? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিলে, কি জানি মানে তার কী!

টিকিট কেনা হলো, মালপত্র তোলা হলো, ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেলে সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম—স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। হয়ত, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই! কেবলই মনে হতে লাগল, অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ, ঢোকবার জো নেই! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা।

শব্দার্থ ও টীকা

ভজন	—	ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্তুতি বা মহিমাকীর্তন। প্রার্থনামূলক গান।
দোর	—	দুয়ার বা দরজা। বাড়ির ফটক।
কুঞ্জ	—	লতাপাতায় আচ্ছাদিত বৃত্তাকার স্থান, উপবন।
বেরিবেরি	—	শোথ জাতীয় রোগ, যাতে হাত-পা ফুলে যায়।
আসামি	—	এ শব্দটি দিয়ে সাধারণত আদালতে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে রোগাক্রান্তদের বোঝানো হয়েছে।
পাণ্ডুর	—	ফ্যাকাশে।
মালি	—	মালা রচনাকারী, মালাকর। বেতনের বিনিময়ে বাগানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি।
মালিনী	—	মালির স্ত্রী।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা মানবেতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহার করে সহানুভূতিশীল হবে।

পাঠ-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেওঘরের স্মৃতি' গল্পটির নাম পাল্টে এবং ঈষৎ পরিমার্জনা করে এখানে 'অতিথির স্মৃতি' হিসেবে সংকলন করা হয়েছে। মানবেতর একটি প্রাণীর সঙ্গে একটি অসুস্থ মানুষের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি মমত্বের সম্পর্কই এ গল্পের বিষয়। লেখক দেখিয়েছেন, মানুষে-মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্ক স্থায়ীরূপ পেতে বাধাগ্রস্ত হয় নানা প্রতিকূল কারণে। আবার এই সম্পর্কের সূত্র ধরে একটি মানুষ ওই জীবের প্রতি যখন মমতায় সিক্ত হয় তখন অন্য মানুষের আচরণ হয়ে উঠতে পারে নির্মম। সম্পর্কের এই বিচিত্র রূপই তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পে।

লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় ভাগলপুরে, মাতুলালয়ে। দারিদ্র্যের কারণে কলেজ শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে। জীবিকার সন্ধানে রেঙ্গুন গমন ও সেখানে অবস্থানকালে (১৯০৩–১৯১৬) সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর একের পর এক গল্প-উপন্যাস লিখে তিনি এমনভাবে পাঠকহৃদয় জয় করেন যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হন। সাধারণ বাঙালি পাঠকের আবেগকে তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে : পল্লীসমাজ, দেবদাস, শ্রীকান্ত (চার খণ্ড), গৃহদাহ, দেনাপাওনা, পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন প্রভৃতি। সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের এই কালজয়ী কথাশিল্পীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতায়।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি ভ্রমণকাহিনীর বিবরণ লেখ (একক কাজ)।

খ. তোমার প্রিয় কোনো পশু বা পাখির কোন কোন আচরণ তোমার কাছে মানুষের আচরণের মতো মনে হয়, তার একটি বর্ণনা দাও (একক কাজ)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাত ব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা কখন ঘরে প্রবেশ করে ?

ক. সন্ধ্যার পূর্বে	খ. সন্ধ্যার পরে

গ. বিকেল বেলা	ঘ. গোধূলি বেলা

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডি.লিট উপাধি পেয়েছেন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ?

ক. ঢাকা	খ. কলকাতা

গ. অক্সফোর্ড	ঘ. কেমব্রিজ

৩. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

i. কোনো তিথি না মেনে কারো আগমনকে

ii. মাত্রাতিরিক্ত সময় আতিথেয়তা গ্রহণ করাকে

iii. অবাঞ্ছিতভাবে কোনো অতিথির অধিক সময় অবস্থানকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. i ও ii

গ. iii	ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাবা-মার আদরের দুই ছেলে রাহি ও মাহি এবার ক্লাস টুতে পড়ে। ওদের বাবা একদিন ছোট্ট একটি খাঁচায় একটি ময়না পাখি কিনে ওদের উপহার দেয়। সেই থেকে সারাক্ষণ দুই ভাই প্রতিযোগিতা করে পাখিটিকে খাবার দেওয়া, পানি দেওয়া, কথা বলা আর কথা শেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একদিন সকালে দেখে, ইঁদুর এসে রাতে পাখিটাকে মেরে ফেলেছে। সেই থেকে যে তাদের অঝোর ধারায় কান্না, কেউ আর থামাতেই পারে না। আজও সেই ময়নার কথা মনে হলে ওরা কেঁদে ওঠে।

৪। উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক

ii. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক

iii. ভালোবাসায় সিক্ত পশু-পাখির বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে ?

ক. বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

খ. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

গ. অতএব আমার অতিথি করে উপবাস

ঘ. আজ তুই খেয়ে যাবি, না খেয়ে যাসনে বুঝলি।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মহেশ। দরিদ্র বর্গাচাষি গফুরের অতি আদরের একমাত্র ষাঁড়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ওকে ঠিকমত খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারে না। জমিদারের কাছে সামান্য খড় ধার চেয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে থাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেটে যায়। সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে—মহেশ, তুই আমার ছেলে। তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস। তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারিনে, কিন্তু তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহেশ প্রত্যুত্তরে গলা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুজে থাকে।

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেওঘরে গিয়েছিলেন কেন ?

খ. অতিথি কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না কেন ?

গ. উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের গফুরের সাথে লেখকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন–'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

২. শেরপুরের নাইমুদ্দিন প্রায় ১০ বছর ধরে তার পোষাহাতি, কালাপাহাড়কে দিয়ে লাকড়ি টানা, চাষ করা, সার্কাস দেখানো ইত্যাদি কাজ করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণে হাতির খোরাক জোগাড় করতে না পেরে একদিন সে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। ক্রেতা কালাপাহাড়কে নিতে এসে ওর পায়ে বাধা রশি ধরে হাজার টানাটানি করে একচুলও নাড়াতে পারল না। কালাপাহাড়ের দুচোখ বেয়ে শুধু টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পরদিন খদ্দের আরও বেশি লোকজন সাথে করে এসে কালাপাহাড়কে নিয়ে যাবে বলে চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা নাইমুদ্দিন দেখে—কালাপাহাড় মরে পড়ে আছে। হাউমাউ করে সে চিৎকার করে আর বলে—'ওরে আমার কালাপাহাড়, অভিমান করে তুই চলে গেলি!'

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন পদক লাভ করেন ?

খ. লেখক দেওঘর থেকে বিদায় নিতে নানা অজুহাতে দিন দুই দেরি করলেন কেন ?

গ. কালাপাহাড়ের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. 'উদ্দীপকের নাইমুদ্দিনের অনুভূতি আর 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত'—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

বাঙালির বাংলা

কাজী নজরুল ইসলাম

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে—'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তমঃ, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয় বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমকে শাসন করতে পারে একমাত্র রজোগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্র-শক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ব—বিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগল না বলে দিব্যশক্তি কোনো কাজে লাগল না—বাঙালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদগীরণ করল না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ত্বগুণের প্রধান শত্রু তমোগুণকে প্রবল ক্ষাত্রশক্তি দমন করে। অর্থাৎ, আলস্য, কর্ম-বিমুখতা; পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনশক্তিকে চির-জাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজ-প্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, জরা ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালির মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, ব্যাধিতে, অভাবে, দৈন্যে, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈব-শক্তির লীলা-নিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদয়-গুহার অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদী রূপে আমাদের মাঠে-ঘাটে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলা বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য- প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য-উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ—আল্লাহ, ভগবানের উপাসনা, উপবাস-উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনও ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণ-রেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে

ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্ম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশি লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না, উলটো তাদের দাসত্ব করি; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি।

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজ বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লেখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র ফকির-দরবেশ অলি-গাজির দরগা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্ম-বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর, বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নীরব বিদেশির দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রু। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র সৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, মায়াময় অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে, হায় তারা এই অপমান এই দাসত্ব বিদেশি দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কী করে সহ্য করে? ঐশী ঐশ্বর্য– যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব, লাঞ্ছনা। বাঙালি ক্ষাত্রশক্তিকে অবহেলা করল বলে তার এই দুর্গতি তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবি ফসল তার সোনা তামা লোহা কয়লা—তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশি দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য। খবরদার, যে রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে—তাকে প্রহারেণ ধনঞ্জয় দিয়ে বিনাশ করব, সংহার করব।

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির—আমাদের।
দিয়া প্রহারেণ ধনঞ্জয়
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশি দস্যু ডাকাত
রামাদের গামাদের।

বাংলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক। বাঙালির জয় হোক।

শব্দার্থ ও টীকা

দিব্যশক্তি	—	ঐশ্বরিক শক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা।
তমসাচ্ছন্ন	—	অন্ধকারাবৃত, অন্ধকারে ঢাকা।
তামসিকতা	—	তমোগুণ বিশিষ্ট, অজ্ঞানজনিত ভাব, ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন।
তম, তিমির	—	অন্ধকার। প্রকৃতির তিনগুণের তৃতীয়টি তম বা অন্ধকার।
সাত্ত্বিক	—	সত্ত্বগুণ সম্পর্কিত, কামনাশূন্য, ফলের আকাঙ্ক্ষাবিহীন।
অবিদ্যা	—	অজ্ঞান, বিদ্যাহীন, মূর্খতা।
জড়তা	—	চেতনাহীন, নির্জীব, এখানে ভুলকর্ম।
অমৃতের পানে	—	সত্যের দিকে, আলোর পথে সাফল্যের কাছে।
রজগুণ	—	প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বিতীয়টি। যার প্রভাবে মনে দ্বেষ বা অহঙ্কার জন্মে।
ক্ষাত্রশক্তি	—	ক্ষত্রিয়ের শক্তি। যুদ্ধ করার ক্ষমতা।
ব্রহ্মশক্তি	—	ব্রহ্মজ্ঞানজনিত শক্তি, তেজ।
ত্রিগুণান্বিত	—	সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণ বিশিষ্ট। মানুষ এই তিন গুণে গুণান্বিত।
সত্ত্ব	—	প্রকৃতির তিনগুণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গুণ। এর অর্থ সত্তা, নিত্যতা, অস্তিত্ব, আত্মা, জীবন।
ঐশীশক্তি	—	ঐশ্বরিক শক্তি, ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি, অসীম ক্ষমতা।
আলস্য	—	অলস, শ্রমবিমুখ।
কর্ম-বিমুখতা	—	কাজের প্রতি আসক্তিহীন, কাজের প্রতি আগ্রহ না থাকা।
পঙ্গুত্ব	—	চলৎশক্তি রহিত, চলতে না পারা।
নৈরাশ্য	—	নিরাশা, হতাশা।
জরা	—	বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, জীর্ণতা, স্থবিরতা।
ক্লৈব্য	—	পৌরুষহীনতা, কাপুরুষতা।
মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময়	—	মস্তিষ্ক অর্থাৎ মাথা ও হৃদয় পরমেশ্বরের রূপে পরিপূর্ণ। স্রষ্টার জ্যোতিতে ভাস্বর।
দেহ ও মন পাষাণময়	—	বাঙালির দেহ ও মন কর্মের ক্ষেত্রে পাষাণের মতো কঠিন। আপন কর্ম সম্পাদনে তারা নির্ভীক এবং একনিষ্ঠ।
গিরি হিমালয়	—	হিমালয় পর্বত, ভারতের উত্তর সীমানায় অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত পর্বতশ্রেণি।
দহন	—	অগ্নি, দগ্ধকরণ, জ্বালা।
দাহন	—	পোড়ানো।
প্রসন্ন	—	সন্তুষ্ট, খুশি, আনন্দিত, সদয়, নির্মল, উজ্জ্বল।
চিরবসন্ত	—	বসন্ত—ফাল্গুন চৈত্র দুই মাস; মধুমাস, ঋতুরাজ; বাংলাদেশে অনন্তকাল ধরে মধুমাস অর্থে।
আত্মীয়তাবোধ	—	নির্বিশেষে সবাইকে আপন ভাবা, নিকটজন জ্ঞান করা।
স্বর্ণরেণু	—	সোনার কণা।
সর্বৈশ্বর্যময়ী	—	সর্ব ঐশ্বর্যময়ী। সব দিক থেকে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ।
পীঠস্থান	—	বেদি, পবিত্রস্থান।
সঞ্জীবনীশক্তি	—	উজ্জীবিত করার শক্তি।
নিত্য মহিমাময়ী	—	প্রতিনিয়ত গৌরবমণ্ডিত, গৌরবান্বিত।
দুর্গতি	—	দুরবস্থা, শোচনীয় অবস্থা।
বাটপাড়ি	—	প্রতারণা, ঠকানো।
প্রহারেণ ধনঞ্জয়	—	প্রহার দ্বারা শাসন।
রামাদের গামাদের	—	এখানে বাইরে থেকে আগত জাতিকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির স্বাধীকার চিন্তা ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।

পাঠ-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধটি 'নবযুগ' পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৩রা বৈশাখ প্রকাশিত হয়। লেখক তাঁর প্রবন্ধে বাঙালি জাতির সোনালি অতীত স্মরণ করে বলেছেন : এ দেশ মুনি, ঋষি, যোগী, ফকির, দরবেশ, অলি, গাজিদের পীঠস্থান। এখানকার মানুষ শত শত বছর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মবোধ জাগ্রত রেখে সম্প্রীতিময় পরিবেশে বসবাস করছে। বাংলার মাটিতে সোনালি ফসল ফলে, মধুময় এর প্রাকৃতিক পরিবেশ। মানুষে মানুষে এমন গভীর আত্মীয়তা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এদেশের ভেতর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হয়েছে। সেখানে আছে মৎস্য-সম্পদ। ভূমির গভীরে আছে প্রচুর কয়লাসহ খনিজ পদার্থ। এ কারণে বার বার বিদেশিরা এদেশ আক্রমণ করেছে। এদেশের মানুষ জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তিতে পৃথিবীখ্যাত। কিন্তু আলস্য তাদের দুর্বল করে রেখেছে। বাঙালিরা যে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে ইতিহাসে সে সাক্ষ্য আছে। স্বাধীনতার জন্য ধারাবাহিক সংগ্রামে বহু বাঙালি আত্মোৎসর্গ করেছেন। এখন আলস্য আর কর্ম-বিমুখতার জন্য তারা পিছিয়ে আছে। এই আলস্য আর কর্ম-বিমুখতাকে উপেক্ষা করে বাঙালিকে জেগে উঠতে হবে। বিদেশি যে শক্তি বাঙালির সম্পদ ও ঐশ্বর্য চুরি করতে চায় সে শক্তিকেও করতে হবে প্রতিরোধ। তবেই এই বাংলা প্রকৃত অর্থে বাঙালির হবে। বাঙালির জয় অবশ্যম্ভাবী।

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর রচনাবলি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প-সাহিত্যের সকল শাখায় আমরা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে থাকি। বাংলায় তিনি ইসলামি গান ও গজল লিখে প্রশংসা পেয়েছেন। তিনি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক', 'রিক্তের বেদন' ইত্যাদি। কবি ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সংগ্রহ করে শ্রেণি-শিক্ষার্থীরা একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (দলীয় কাজ)।

খ. রচনাটিতে যেসব শব্দ তোমার কাছে নতুন তার একটি তালিকা প্রণয়ন কর (একক কাজ)।

গ. বাঙালির অসাধ্য সাধন করার ইতিহাসের যেকোনো একটি কাহিনি (৩০০ শব্দের মধ্যে) লেখ। যেমন : মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অবিদ্যা কাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি বাধা-বিঘ্ন আনে?

ক. সাত্ত্বিক ভাবাপন্নদের খ. ক্ষাত্রশক্তি ভাবাপন্নদের

গ. রজগুণ ভাবাপন্নদের ঘ. ব্রহ্মশক্তি ভাবাপন্নদের

২। 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?

ক. ধূমকেতু খ. নবযুগ

গ. লাঙল ঘ. আঙুর

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বলেন, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের সবার দায়িত্ব আপনাদের উপর'।

৩। উদ্দীপকে 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধের প্রতিফলিত ভাব হলো—

i. স্বদেশ চেতনা

ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনা

iii. সংগ্রামী চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. ii খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪। উক্ত ভাবটি নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে?

ক. বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান খ. আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী

গ. এই পবিত্র দেশ বাঙালির ঘ. বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে—আমার জন্মভূমি।

ক. সত্ত্বগুণের প্রধান শত্রু কোনটি?

খ. 'বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধের যে দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য বিষয় উপস্থাপনই কী কাজী নজরুল ইসলামের মূল লক্ষ্য?–'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধের আলোকে যুক্তি দাও।

২. ১) চলতে ওরা চায়না মাটির ছেলে
মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।

২) অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল আগে চল!
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল
গাও প্রভাতের গান!

ক. বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে কে?

খ. 'বাংলা বাঙালির হোক'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপক-১ এ 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধের আলোকে উদ্দীপক ১-এর সঙ্গে উদ্দীপক ২-এর সম্পর্ক নির্ণয়পূর্বক এর যথার্থতা যাচাই কর।

পড়ে পাওয়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

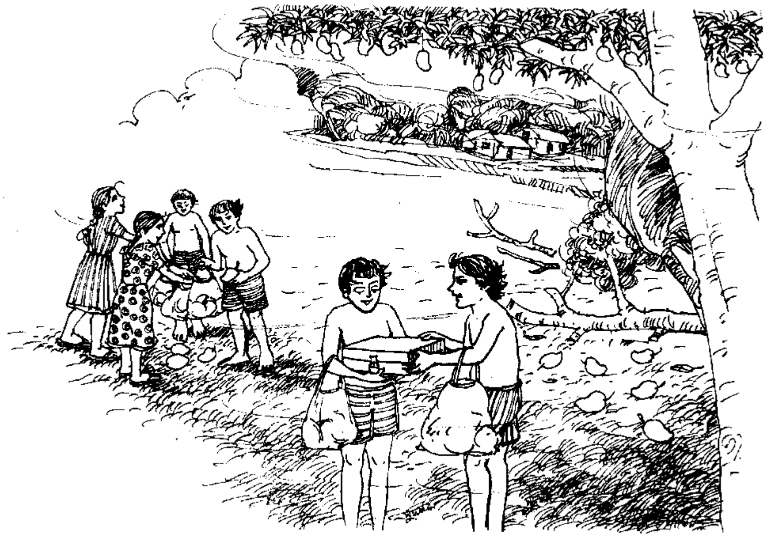

কালবৈশাখীর সময়টা। আমাদের ছেলেবেলার কথা। বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল এবং আরও অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি। বেলা বেশি নেই। বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড়। সে হঠাৎ কান খাড়া করে বললে—ঐ শোন—আমরা কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম—কী রে? বিধু আমাদের কথার উত্তর দিলে না। তখনো কান খাড়া করে রয়েছে। হঠাৎ আবার সে বলে উঠল—ঐ-ঐ-শোন—আমরাও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ। নিধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—বিধু ধমক দিয়ে বলে উঠল—কিছু না মানে? তুই সব বুঝিস কিনা? বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে ওরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস? ঝড় উঠবে। এখন জলে নামব না। কালবৈশাখী। আমরা সকলে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ও কী বলছে। কালবোশেখির ঝড় মানেই আম কুড়ানো! বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মিষ্টি কী! এই সময়ে পাকে। ঝড় উঠলে তার তলায় ভিড়ও তেমনি। যে আগে গিয়ে পৌছতে পারে তারই জয়। সবাই বললাম—তবে থাক। কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে। আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ তখনো দূর হয় নি। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না; তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মতো চাপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে। যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে। সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখুনি চাঁপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে।

এরপর আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম।

অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ। ভীষণ ঝড় উঠল, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগল পশ্চিম থেকে। বড় বড় গাছের মাথা ঝড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ধুলোতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠান্ডা হাওয়া বইল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পড়তে চড় চড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামল।

বড় বড় আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আম ঝরছে শিলাবৃষ্টির মতো; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক এক বোঝা আম। আমরাও যথেষ্ট আম কুড়ুলাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন। ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ি চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে। আমি আর বাদল সন্ধ্যের অন্ধকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি। পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট-বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনাসুদ্ধ নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে পথ ভর্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ-অন্ধকারের মধ্যে।

এমন সময় বাদল কী একটা পায়ে বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমায় বললে—দ্যাখ তো রে জিনিসটা কী?

আমি হাতে তুলে দেখলাম একটি টিনের বাক্স, চাবি বন্ধ। এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলে, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স। টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে। এ আমরা জানি।

বাদল হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বললে—দেখি জিনিসটা?

— দ্যাখ তো, চিনিস?

— চিনি, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স।

— টাকাকড়ি থাকে।

— তাও জানি।

— এখন কী করবি?

— সোনার গহনাও থাকতে পারে। ভারী দেখেছিস কেমন?

— তা তো থাকেই। টাকা গহনা আছেই এতে।

টিনের ক্যাশ বাক্স হাতে আমরা দুজনে সেই অন্ধকারে তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম। দুজনে এখন কী করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে। আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল-ঝড় অগ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল, থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে।

বাদল বললে—কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—

— তা তো বটেই। কে জানবে আর।

— এখন কী করা যায় বল।

— বাক্স তো তালাবন্ধ—

— এখুনি ইট দিয়ে ভাঙি যদি বলিস তো—ও, না জানি কত কী আছে রে এর মধ্যে। তুই আর আমি দুজনে নেব, আর কেউ না। খুব সন্দেশ খাব।

ঝড়ের ঝাপটা আবার এলো। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে চলে গিয়েছে। অন্য দিনে আমাদের দুজনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।

বাদল বলল—শীতে কেঁপে মরছি। কী করা যাবে বল। বাড়ি কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না। তাহলে সবাইকে ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কী করবি?

— আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।

— ভাঙি তালা। ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে।

— না। তালা ভাঙিসনে। ভাঙলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙলে, ভেবে দ্যাখ। কোনো গরিব লোকের হয়তো। আজ তার কী কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেব বাক্সটা।

বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?

— দেব ভাবছি।

— কী করে জানবি কার বাক্স?

— চল, সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।

এক মুহূর্তে দুজনের মনই বদলে গেল। দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাক্স ফেরত দেয়ার কথা মনে আসতেই

আমাদের অদ্ভুত পরিবর্তন হলো। বাক্স নিয়ে জল-ঝড়ে ভিজে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাড়ি চলে এলাম। বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হলো বাক্সটা। তারপর আমাদের দলের এক গুপ্ত মিটিং বসল বাদলদের ভাঙা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন—আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফোটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোষ্টমের ডোবায়।

আমাদের দলের সর্দার বিধুর নির্দেশমতো এ মিটিং বসেছিল। বাক্স ফেরত দিতেই হবে- এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ সে প্রস্তাব পেশ করার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে বলা হলো বাক্স ফেরত দেয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাক্সের মালিককে খুঁজে বের করার। কারও মাথায় কিছু আসে না। এ নিয়ে অনেক কল্পনা-জল্পনা হলো। যে কেউ এসে বলতে পারে বাক্স আমার। কী করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করব? মস্ত বড় কথা। কোনো মীমাংসাই হয় না।

অবশেষে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি।

বলেছি—বিধুর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। দু-তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হলো।

বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক। ওর হাতের লেখা ভালো।

বাদল বলল—কী লিখব বলো—

— লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মতো। বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি—

— বলো—

— আমরা একটা বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাক্স তিনি রায়বাড়িতে খোঁজ করুন। ইতি - বিধু, সিধু, নিধু, তিনু।

আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম—বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি? আমাদের ভালো নাম লেখ।

বিধু বললে—লিখে দাও। ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখ।

তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেয়া হলো।

দু-তিন দিন কেটে গেল।

কেউ এল না।

তিন দিন পরে একজন কালোমতো রোগা লোক আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কী চাও?

— বাবু, ইদিরভীষণ কার নাম?

— আমার নাম। কেন? কী চাই?

— একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?

আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তিভাবে বললাম—কী রকম বাক্স?

— কাঠের বাক্স।

— না। যাও।

— বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।

— কী রঙের টিন?

— কালো।

— না। যাও—

— বাবু দাঁড়ান, বলছি। মোর ঠিক মনে হচ্ছে না। এই রাঙা মতো—

— না, তুমি যাও।

লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে—ওর নয় রে। লোভে পড়ে এসেছে। ওর মতো কত লোক আসবে।

আবার তিন-চার দিন কেটে গেল।

বিধুর কাছে একজন লোক এলো তারপরে। তারও বর্ণনা মিলল না; বিধু তাকে পত্রপাঠ বিদায় দিলে । যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে নেবে আমাদের ইত্যাদি। বিধু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে– যাও যাও, যা পার করো গিয়ে। বাক্স আমরা কুড়িয়ে পাইনি। যাও।

আর কোনো লোক আসে না।

বর্ষা পড়ে গেল।

সেবার আমাদের নদীতে এলো ভীষণ বন্যা।

বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অম্বরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি সেবারেও দেখে এসেছি—কী চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়োর ক্ষেত, লাউ-কুমড়োর মাচা ওদের চরে! দু পয়সা আয়ও পেত তরকারি বেচে। কোথায় রইল তাদের পটল-কুমড়োর আবাদ, কোথায় গেল তাদের বাড়িঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগল অম্বরপুর চরের কাপালিরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে।

একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এলো। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে। আরও দু-একজন প্রজা এসেছে খাজনা পত্তর দিতে। আমরা দু ভাই বাবার কড়া শাসনে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি। এমন সময় একটা লোক এসে বললে—দণ্ডবৎ হই, ঠাকুরমশায়।

বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

— আজ্ঞে অম্বরপুর থেকে। আমরা কাপালি।

— বোসো। কী মনে করে? তামাক খাও। সাজো।

লোকটা তামাক সেজে খেতে লাগল। সে এসেছে এ গাঁয়ে চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে নির্বিষখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সেও এবার ফুরিয়ে এলো। চাকরি না করলে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরবে।

বাবা বললেন—আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।

লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তা খাব। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্টি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরছি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াই শো টাকার গহনা আর পটল বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুর গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হলো না। সেই হলো শুরু—আর তারপর এলো এই বন্যে—

বাবা বললেন—বল কী? অতগুলো টাকা-গহনা হারালে?

—অদেস্ট, একেই বলে বাবু অদেস্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে—

আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম। বলে উঠলাম—কী রঙের বাক্স?

— সবুজ টিনের।

বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধমক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কী দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে এক ছুটে বিধুর বাড়ি গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কী না?

বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হলে উকিল হবে, সবাই বলত।

আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে—ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা? গরিবের ওপর এত দয়া আপনাদের?

বিধু অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে—দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কী না আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে? কাকাবাবু আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে—লিখতে জান তো?

না, ও উকিলই হবে!

আমার বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না।

শব্দার্থ ও টীকা

দিব্যি	—	চমৎকার। আশাতীতভাবে।
সংশয়	—	সন্দেহ। দ্বিধা।
গহনা	—	অলংকার।
অনাদৃত	—	অবহেলিত। উপেক্ষিত। গুরুত্ব দেয়া হয়নি এমন।
বিচুলিগাদা	—	ধানের খড়ের স্তূপ।
নাটমন্দির	—	দেবমন্দিরে সামনের ঘর যেখানে নাচ-গান হয়।
বোষ্টম	—	হরিনাম সংকীর্তন করে জীবিকা অর্জন করে এমন বৈষ্ণব।
অপ্রতিভভাবে	—	বিব্রত বা লজ্জিতভাবে।
পত্রপাঠ বিদায়	—	তৎক্ষণাৎ বিদায়।
চৌকিদার	—	প্রহরী।
কাপালি	—	তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায়।
চণ্ডীমণ্ডপ	—	যে মণ্ডপে বা ছাদযুক্ত চত্বরে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পুজো হয়।
দণ্ডবৎ	—	মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গো প্রণাম।
আড়ি	—	ধান, গম ইত্যাদির পরিমাপবিশেষ। ধান মাপার বেতের ঝুড়ি বা পাত্র।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা ও নৈতিক চেতনার সৃষ্টি।

পাঠ-পরিচিতি

এটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প। এটি 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ গল্পের কিশোররা কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ নিয়ে লোভের পরিচয় দেয়নি। বরং তারা তাদের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, বয়সে ছোট হলে কী হবে তাদের নৈতিক অবস্থানও বেশ দৃঢ়। এই গল্পে কিশোরদের ঐক্যচেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাদের উন্নত মানবিক বোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোরদের এমন সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে বয়োজ্যেষ্ঠরাও বিস্মিত, অভিভূত। কিশোররা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তারা তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও বিবেচক তাকে মান্য করে তার ওপর আস্থা স্থাপন করে। এটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার চিত্রও ফুটে উঠেছে এ গল্পে।

লেখক-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগনা জেলার মুরাতিপুর গ্রামে, মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাকপুর গ্রামে। তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। মাতার নাম মৃণালিনী দেবী। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিত্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়াকালে (১৯১৮) তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে। অতঃপর স্কুল শিক্ষকতাসহ নানা পেশায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। এর বাইশ বছর পরে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন (১৯৪০)। ছোটগল্প, উপন্যাস, দিনলিপি ও ভ্রমণ-কাহিনী রচনার মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পান। তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানবজীবন এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন সত্তায় সমন্বিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের সজীব ও নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' উপন্যাস যেমন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 'আরণ্যক', 'ইছামতী'; গল্পগ্রন্থ : 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল'; ভ্রমণ-দিনলিপি : 'তৃণাঙ্কুর', 'স্মৃতির রেখা'; কিশোর উপন্যাস : 'চাঁদের পাহাড়', 'মিসমিদের কবচ', 'হীরামানিক জ্বলে'। ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ভালো কাজ করলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার পক্ষে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত কর (একক কাজ)।

খ. অন্যের হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাওয়ার পর কীভাবে তুমি তা যথার্থ ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেবে?— এ বিষয় অবলম্বনে একটি গল্প লেখ (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাদের বাগানে আম কুড়াতে কালবোশেখি উপেক্ষা করে সবাই ছুটছিল?

ক. চাটুয্যেদের খ. মুখুয্যেদের

গ. বাড়ুয্যেদের ঘ. গাঙ্গুলিদের

২. চাঁপাতলীর আমের ব্যাপারে এত আগ্রহের কারণ তা—

i. প্রচুর পাওয়া যায়

ii. খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু

iii. নির্বিঘ্নে কুড়ানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. iii

৩. লেখকের চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত 'দিব্যি' শব্দটি আমরা আর কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি ?

ক. শপথ খ. বিশ্বাস

গ. সংশয় ঘ. অনবরত

নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্কুলের ঝাড়ুদার শচী। পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিষ্কার করতে গিয়ে সে একটি মূল্যবান ঘড়ি পেল। তার লোভ হলো। ভাবল, ঘড়িটা মেয়ের জামাইকে উপহার দেবে। মেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়ে মনে হলো—এ অন্যায়, অনুচিত। যার ঘড়ি তার মনোকষ্টের কারণে মেয়ের চরম অকল্যাণ হতে পারে। ঘড়িটা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া তার কর্তব্য। সে পরদিন তাই করল।

৪. শচী 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিভূ ?

ক. বাদল খ. বিধু

গ. কথক ঘ. সিধু

৫. উল্লিখিত তুলনাটা কোন মানদণ্ডে বিচার্য ? উভয়েই—

i. ন্যায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ

ii. লোকলজ্জার ভয়ে ভীত

iii. অকল্যাণ চিন্তায় তাড়িত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ টেক্সি ক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সহসা গাড়ির ভিতরে দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল একটি মানিব্যাগ পড়ে আছে সিটের ওপর। ব্যাগে অনেকগুলো ডলার। কিন্তু ব্যাগে কেনো ঠিকানা পাওয়া গেল না। সে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করল। নিরুপায় হয়ে সে পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদককে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানায়।

ক. 'পড়ে পাওয়া' কী ধরনের রচনা ?

খ. 'ওর মতো কত লোক আসবে'। বিধুর এ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের আরিফকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায় ?—বুঝিয়ে লেখ।

ঘ. কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল সুরকেই ধারণ করে আছে।—মূল্যায়ন কর।

২. সন্ধ্যায় দেখা গেল, নিজেদের ছাগলের সাথে অতিরিক্ত একটি ছাগলও আথালে ঢুকছে। এশার নামাজ পার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ খোঁজ নিতে এল না। দাদু বললেন, না, না, চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। এক কাজ কর, রফিক-শফিক বেরিয়ে পড়। প্রতিবেশী নাবিল আর তালিমকে সাথে নিয়ে দুজন দুদিকে যেও। মসজিদ থেকে চোঙ্গা নিয়ে গাঁয়ে ঘোষণা দিয়ে আস। কিছুক্ষণের মধ্যে দু-ভাই দাদুর পরামর্শ মতো বলতে লাগল, ভাইসব, একটি ছাগল পাওয়া গেছে। যাদের ছাগল তারা দয়া করে মতিন শিকদারের বাড়ি থেকে নিয়ে যান।

ক. লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন ধরনের লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত ?

খ. 'দুজনই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম।' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফোঁকার ঘটনাটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের দাদু যেন 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল চেতনারই প্রতিভূ। বিশ্লেষণ কর।

তৈলচিত্রের ভূত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন সকাল বেলা পরাশর ডাক্তার নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল। পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন, বোসো, নগেন। চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে ঠিকানা লিখে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আবার নগেনের দিকে তাকালেন।

'বসতে বললাম যে? এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? অসুখ নাকি'?

নগেন ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে চুরি করে কিনা, এইরকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল, 'না না, অসুখ নয়, অসুখ আবার কিসের'।

গুরুতর কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দুহাতের আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটাসোটা হাসিখুশি ছেলেটার তেল চকচকে চামড়া পর্যনত যেন শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদভ্রান্ত। কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে।

নগেন তার মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটেছে যাতে ছেলেটা এরকম বদলে যেতে পারে? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে বটে কিন্তু মামার শোকে এরকম কাহিল হয়ে পড়ার মতো আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনো দিন ছিল না। বড়লোক কৃপণ মামার যে ধরনের আদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে তাতে মামার পরলোক যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত তাও পরাশর ডাক্তার ভালো করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা

হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ শেষ সময়ে কী ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন। নগেন হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'ডাক্তার কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কী পাগল হয়ে গেছি'? পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তোমার মাথা হয়ে গেছ'। পাগল হওয়া কী মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না সে পাগল হয়ে গেছে।'

'তবে'—দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ডাক্তার কাকা, প্রেতাত্মা আছে'?

'প্রেতাত্মা মানে তো ভূত ? নেই'।

'নেই? তবে'—

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনি। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এরকম উদারতা সে কোনো দিন কল্পনাও করতে পারে নি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন,মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিতে তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল এরকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ। শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল—শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, সারা জীবন তো ভক্তিশ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্য সত্যই ভক্তিশ্রদ্ধা জেগে থাকে লাইব্রেরি ঘরে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, বাড়ি অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপার হবে সে জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামশায়ের আমলের। লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। তার আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আলমারি কয়েকটি অল্প দামি আর অনেক দিনের পুরোনো, ভেতরগুলি বেশির ভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং উপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানা রকম ভাঙাচোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা। টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুব সম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এ ঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে তিনটি বড় বড় তৈলচিত্র, সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো। তা ছাড়া কয়েকটা পুরানো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে—কোনোটাতে ডিসেম্বর, কোনোটাতে চৈত্রমাসের বারো তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনো ঝুলছে।

তৈলচিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈলচিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙানো আছে, মামার তৈলচিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি।

কারো ঘুম ভেঙে যাবে ভয়ে নগেন আলো জ্বালে নি। কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এ বাড়ির আনাচ-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরিতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈলচিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে 'আমায় ক্ষমা করো মামা' বলে যেই সে তৈলচিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে—বর্ণনার এখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল। তার মুখ আরও বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দুচোখ বিস্ফোরিত।

'তারপর'?

নগেন ঢোক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেপে বলল, 'যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠল তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি'।

পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আগে কোনো দিন ফিট হয়েছিল নগেন' ?

নগেন মাথা নেড়ে বলল 'ফিট? না, কস্মিনকালেও আমার ফিট হয় নি। আপনি ভুল করেছেন ডাক্তার কাকা, এ ফিট নয়, মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন আগে, তা হলে বুঝতে পারবেন'।

সমস্ত সকাল নগেন মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল, ভক্তি ভালোবাসার ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এখন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে তার তৈলচিত্রটি পর্যন্ত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। যাই হোক, নগেন একালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর তার মনে নানারকম দ্বিধা-সন্দেহ [illegible] রাত্রে যা ঘটেছে তা নিছক স্বপ্ন কিনা। ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রণাম করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন?

এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, [illegible] সেখানটা ফুলে টনটন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার তৈলচিত্রের নিচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার কী প্রমাণ আছে?

নগেন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনের শান্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে। দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেয়ার ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কী সর্বনাশ! তবে তো রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায় না।

এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেই নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কী করে? খানিকটা পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির। ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা—পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ, চোখে ভৎর্সনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, কিন্তু সমস্ত শরীর হঠাৎ যেন কেমন অস্থির অস্থির করতে লাগল। তৈলচিত্র থেকে কী যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এরকম অস্থির অস্থির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলোটা থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তাতে বিশেষ কী আসে যায়? ইতস্তত না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে—

'ঠিক প্রথম রাত্রের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে [illegible]

'অজ্ঞান হয়ে গেলে'?

'না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাই নি। অবশ্য আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়ে ছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাক্তার কাকা। দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পারি না, কিসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে'।

পরাশর ডাক্তার খানিক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর আর কোনো দিন ছবিটা ছুঁয়েছো' ?

'কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুঁয়েছি, আলো জ্বেলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জ্বেলে ছুঁয়ে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। কোনো দিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনো দিন জ্ঞান থাকে'

বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, 'আমি কী করব ডাক্তার কাকা? এমন করে কদিন চলবে' ?

পরাশর ডাক্তার বললেন, 'তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি যাব'।

একটু থেমে আবার বললেন, 'ভূত বলে কিছু নেই, নগেন'।

তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরোনো কাগজের একটা ভাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে কাঁপছে। কীসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যত সব অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে? তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগেন যে কাহিনি শুনিয়েছে, সারা দিন ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন নি। একদিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিস্তেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরও একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

অশরীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ সমস্তের আর কী মানে হয়?

হয়—নিশ্চয় হয়: মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজে [illegible] এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে [illegible] মামার তৈলচিত্রটি [illegible] এঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলির [illegible] চোখে পড়ল [illegible] পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। তৈলচিত্রের দিকে দুটি উজ্জ্বল চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস [illegible] 'অনেকটা জ্বলর ডাক্তার কাকা' ?

পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন—'না'।

রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু একটা আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার কমে নি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র।

নগেন আবার ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর [illegible], কিন্তু মামার ছবিটি মরবার আগে মামা নিজে শখ করে আঁকিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই'—

নগেনের [illegible] স্বরে স্পষ্ট টের পাওয়া যায়: 'ভয় পেয়ে গেছেন' ?

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বলজ্বলে চোখ দুটির জ্যোতি যেন অনেক কমে গেল। হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তার হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তার কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈলচিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তার শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পেছন দিকে দু পা ছিটকে দিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন আলোর সুইচ টিপে দিল।

মিনিট পাঁচেক পরাশর ডাক্তার চোখ বুঁজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নগেনের মামার রুপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।

তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, 'তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন'।

রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'গাধাও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। এত কথা বলতে পারলে আমাকে আর এই কথাটা একবার বলতে পারলে না যে তোমার মামার ছবিটা ইতোমধ্যে রুপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা হয়েছে' ?

'আমি কি জানি! ছ মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখানে তেমনি অবস্থাতেই আছে'।

'ইলেকট্রিক শক খেয়ে বুঝতে পারো না কীসে শক লাগল, তুমি কোনদেশি ছেলে? আমি তো শক খাওয়া মাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোন প্রেতাত্মা ভর করেছেন'।

নগেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, 'রুপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল, চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেক দিন আগে সিন্ধুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ'।

'হ্যাঁ। সে এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে পয়সা দেব কেন' ?

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ খবরটা যদি আগে দিতে আমায়'—

নগেন সংশয়ভরে বলল, 'কিন্তু ডাক্তার কাকা'—

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'কিন্তু কী? এখনো বুঝতে পারছ না। দিনের বেলা মেন সুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না, ছবি মানে ছবির রুপার ফ্রেমটা। রুপার ফ্রেমটার নিচে কাঠফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেকট্রিকের বিল এমন হুহু করে বেড়ে যেত যে আবার কোম্পানির লোককে এসে লিকেজ খুঁজতে হতো। তুমিও আবার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে। সন্ধ্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে কিনা, তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিভে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই'—

পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তার শরীরটা পথ হিসেবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না। তিনি হাঁফ ছাড়লেন। কপাল ভালো তড়িতাহত হয়ে প্রাণে মরতে হয় নি।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রকাণ্ড	—	অত্যন্ত বৃহৎ। অতিশয় বড়।
বিব্রত	—	ব্যতিব্যস্ত, ব্যাকুল, বিচলিত।
উদ্‌ভ্রান্ত	—	বিহ্বল, দিশেহারা, হতজ্ঞান।
খাপছাড়া	—	বেমানান, উদ্ভট, অসংলগ্ন, এলোমেলো।
শ্রাদ্ধ	—	মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য শ্রদ্ধা নিবেদনের হিন্দু আচার বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান।
উইল	—	শেষ ইচ্ছেপত্র। মৃত্যুর পরে সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে মালিকের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত ব্যবস্থাপত্র বা দানপত্র, যা তার মৃত্যুর পরে বলবৎ হয়।
প্রেতাত্মা	—	মৃতের আত্মা, ভূত।
অনুতাপ	—	আফসোস, কৃতকর্ম বা আচরণের জন্য অনুশোচনা, পরিতাপ।
তৈলচিত্র	—	তেলরঙে আঁকা ছবি।
প্রণাম	—	হাত ও মাথা দ্বারা গুরুজনের চরণ স্পর্শ করে অভিবাদন।
আত্মগ্লানি	—	নিজের ওপর ক্ষোভ ও ধিক্কার, অনুতাপ, অনুশোচনা।
বিস্ফোরিত	—	বিস্তারিত, প্রসারিত, কম্পিত।
কস্মিনকালে	—	কোনো কালে বা কোনো কালেই।
ছলনা	—	কপটতা, শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধোঁকা।
হৃৎকম্প	—	হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, বুকের কাঁপুনি।
মটকা	—	রেশমের মোটা কাপড়।
ভর্ৎসনা	—	তিরস্কার, ধমক, নিন্দা।
ইতস্তত	—	দ্বিধা, সংকোচ, গড়িমসি।
অশরীরী	—	দেহহীন, শরীরহীন, নিরাকার।

পাঠের উদ্দেশ্য

ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে কুসংস্কার বিরাজমান, তা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও অন্তঃসারশূন্য। বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সহজেই দূর করা সম্ভব। গল্পটি পড়ে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে ভয়মুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'তৈলচিত্রের ভূত' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি কিশোর-উপযোগী ছোটগল্প। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ গল্পটি। ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে তা তুলে ধরেছেন। এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানবুদ্ধির জয়। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষ নানা অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে ঘটনা—বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে ঐসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে নগেন-চরিত্রের মধ্যে ভূত-বিশ্বাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূতে পরিণত হয়—এরকম বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকায় নগেন বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে সহজে বিশ্বাস করেছে। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করেন বলে তার কাছে বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টি সহজেই ধরা পড়েছে।

লেখক-পরিচিতি

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতিমান। ১৯০৮ সালে তিনি সাঁওতাল পরগণার দুমকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষের বসতি ছিল বাংলাদেশের বিক্রমপুর অঞ্চলে। 'দিবারাত্রির কাব্য','পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'টিকটিকি', 'হলুদ পোড়া', 'হারানের নাতজামাই' প্রভৃতি ছোটগল্পের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। মানুষের মন বিশ্লেষণের দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। তিনি শ্রমিক-কৃষকের কল্যাণের কথাও ভেবেছেন। শোষণ থেকে তাদের মুক্তির জয়গান গেয়েছেন গল্প-উপন্যাসে। তিনি 'মাঝির ছেলে' নামে একটি কিশোর-উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর কিশোর-উপযোগী গল্পের সংখ্যা ২৭। এর মধ্যে 'কোথায় গেল'? 'জব্দ করার প্রতিযোগিতা', 'তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প', 'ভয় দেখানোর গল্প', 'সনাতনী', 'দাড়ির গল্প', 'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল দারিদ্র্য। ১৯৫৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ৪০০ শব্দের মধ্যে মজা পাওয়ার মতো একটি ভূতের গল্প লেখ (একক কাজ)।

খ. আমাদের সমাজে ভূত ছাড়াও অন্য কী কী কুসংস্কার আছে–সেগুলোর তালিকা করে টীকা লেখ (একক কাজ)। (যাত্রার সময় হাঁচি, যাত্রার সময় পেছন থেকে ডাকা, এক শালিক দেখা, খালি কলম দেখা, কাক ডাকা ইত্যাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি উপস্থাপন)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নগেন কার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত?

ক. মাসির　　খ. পিসির

গ. মামার　　ঘ. দাদার

২. নগেনের সাথে পরাশর ডাক্তারের প্রথম দেখা হয় কখন?

ক. ২ মাস আগে　　খ. ৩ মাস আগে

গ. ৪ মাস আগে　　ঘ. ৫ মাস আগে

৩. নগেন প্রায়ই তার মামাকে যমের বাড়ি পাঠাত কেন ?

ক. পড়ার খরচ না দেয়ায়　　খ. ভালো ব্যবহার না করায়

গ. বিরক্তির ভাব প্রকাশ করায়　　ঘ. অনাদর অবহেলা করায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আদনান সন্ধ্যাবেলা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিল। এক সময় মনে হলো তার পেছনে পেছনে কেউ হাঁটছে। সে পেছনে ফিরে তাকায় কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। ফলে সে ভয়ে কাঁপছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে সে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তার মা বাতি নিয়ে ছুটে এসে দেখেন আদনানের পায়ের জুতার তলে পেরেক গাঁথা একটা কাঠি। এতক্ষণে আদনান ভয়ের কারণ খুঁজে পায়।

৪. উদ্দীপকের আদনান-এর সাথে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের সাদৃশ্যের কারণ—

ক. তাদের বয়স কম খ. তারা অন্ধকারকে ভয় করত

গ. তারা ভীষণ ভিতু ছিল ঘ. তারা ভূত দেখেছিল

৫. এরূপ সাদৃশ্যের মূলে কোনটি বিদ্যমান?

ক. বাস্তবজ্ঞানের অভাব খ. প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়া

গ. মানসিক বিকাশ না হওয়া ঘ. সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা

সৃজনশীল প্রশ্ন

রফিক সাহেব শীতের ছুটিতে ভাগ্নি সাহানাকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যান। রাতের আকাশ দেখার জন্য তারা খোলা মাঠে যান। অদূরেই দেখতে পান মাঠের মধ্যে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠে তা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ওটা কিসের আলো তা জানতে চাইলে সাহানার মামা বলেন, ভূতের! সাহানা ভয় পেয়ে তার মামাকে জড়িয়ে ধরে। মামা তখন তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, খোলা মাঠের মাটিতে এক প্রকার গ্যাস থাকে যা বাতাসের সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে। সাহানা বিষয়টা বুঝতে পেরে স্বাভাবিক হয়।

ক. 'তৈলচিত্রের ভূত' কোন জাতীয় রচনা ?

খ. নগেনের মনে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ জেগেছিল কেন ?

গ. উদ্দীপকের সাহানা আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের বিশেষ মিল কোথায় ?—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রফিক সাহেব আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তার উভয়কে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়?' — উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

শেখ মুজিবুর রহমান

[পূর্বকথা : ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর ক্ষমতায় এসে নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গণতন্ত্রের ধারা অনুসারে পাকিস্তানের শাসনভার পাওয়ার কথা আওয়ামী লীগের অর্থাৎ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ও গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১-এর ৩রা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডেকেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই তিনি হঠাৎ ১লা মার্চ এক ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণা শুনেই পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' ইত্যাদি স্লোগানে শহর-বন্দর-গ্রাম আন্দোলিত হয়।

এই পটভূমিতেই ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৮ মিনিটের ওই ভাষণে তিনি বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। আবেগে, বক্তব্যে, দিক-নির্দেশনায় ওই ভাষণটি ছিল অনবদ্য। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণটিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঐতিহাসিক ভাষণটি এখানে লিপিবদ্ধ হলো।]

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার

অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল-ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে—মার্চ মাসে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব-এমনকি আমি এ পর্যন্ত ও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তি পূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তি পূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা আমাদের পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসব? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ১০ তারিখে ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসি-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন, 'মার্শাল-ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা কোরো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়—হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

(অনুলিখিত)

শব্দার্থ ও টীকা

নির্বাচনের পর	—	১৯৭০-এ অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	—	জাতীয় পরিষদ।
শাসনতন্ত্র	—	রাষ্ট্র পরিচালনার অনুশাসন ও বিধানসমূহ। সংবিধান।
ভুট্টো সাহেব	—	পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির তৎকালীন নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি পাকিস্তানি সামরিক সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙালি যেন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যেতে না পারে সে জন্যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।
আরটিসি	—	রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। গোল টেবিল বৈঠক। সমস্যা সমাধানের কথা বলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেও ভেতরে ভেতরে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

মার্শাল-ল	—	সামরিক আইন। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসন চালু রাখা হয়।
withdraw	—	প্রত্যাহার।
ব্যারাক	—	সেনাছাউনি।
সেক্রেটারিয়েট	—	রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশাসনিক কেন্দ্র। সচিবালয়।
সুপ্রিমকোর্ট	—	সর্বোচ্চ আদালত।
হাইকোর্ট	—	উচ্চ আদালত।
জজকোর্ট	—	জেলা আদালত।
সেমি-গভর্নমেন্ট	—	আধা-সরকারি।
ওয়াপদা	—	ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী রচনাটি পাঠ করলে স্বাধীন বাঙালি জাতি ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম, অবদান এবং বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনার কথা জানতে পারবে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ-পরিচিতি

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্জন করে নিরঙ্কুশ বিজয়। তবুও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ই মার্চ ১৯৭১-এ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণ ৭ই মার্চের ভাষণ হিসেবে বিখ্যাত।

লেখক-পরিচিতি

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের জাতির জনক। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সাহেরা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি ৬ দফা আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাকালে ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পরে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার মহান দায়িত্বে ব্রতী হন। তাঁর সরকারই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে (১৯৭২)। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. বাঙালিদের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কোন আন্দোলনে কী জাতীয় ভূমিকা রেখেছেন, সে সম্পর্কে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)।

খ. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ব্যক্তিগত জীবন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশপ্রেম ইত্যাদি অবলম্বনে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা, ছবি ইত্যাদি রচনা করে দেয়ালিকা প্রকাশ কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

গ. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—এ বিষয় অবলম্বনে পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (একক কাজ, প্রত্যেকের পোস্টারে শ্রেণি ও শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর লিখতে হবে)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত তারিখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন ?

ক. ১৯৬৯-এর ৭ই মার্চ খ. ১৯৭১-এর ৩রা মার্চ

গ. ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ ঘ. ১৯৭৪-এর ৩রা মার্চ

২. রেসকোর্স ময়দানের ভাষণই বাংলাদেশের স্বাধীনতার আহ্বান। কেননা এই ভাষণ—

ক. আজও স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

খ. সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার অঙ্গীকার

গ. অ্যাসেম্বলিতে না বসার আহ্বান

ঘ. বাঙালির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামের আহ্বান

৩. আইয়ুব খানের পতনের পর কে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?

ক শেখ মুজিবুর রহমান খ. ইয়াহিয়া খান

গ. মওলানা ভাসানী ঘ. জুলফিকার আলী ভুট্টো

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেল, জুলুম, নির্যাতনের শিকার হন। নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তাঁর জীবন থেকে কেড়ে নেয় ২৭টি বছর। কিন্তু তিনি কখনও মাথা নত করেন নি। অবশেষে জয় হয় মানবতার, অবসান ঘটে বর্ণবাদের।

৪। বঙ্গবন্ধু ও নেলসন ম্যান্ডেলা—উভয়ের মধ্যে কোন গুণের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ?

i. সহনশীলতা

ii. দেশপ্রেম

iii. আপসহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. বঙ্গাবন্ধুর এই বিশেষ গুণ আমাদের উপহার দিয়েছে—

ক. গভীর দেশপ্রেম খ. বাঙালি সংস্কৃতি

গ. স্বাধীন রাষ্ট্র ঘ. বৈষম্য থেকে মুক্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

গণতন্ত্র যা অহিংসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে সবারই সমান স্বাধীনতা থাকে। যেখানে প্রত্যেকেই হবে তার জগৎ-নিয়ন্তা। এটাই সেই গণতন্ত্র যাতে আপনাদের আজ অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। একদিন আপনারা বুঝতে পারবেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যাওয়া এবং আপনারা আপনাদের শুধু মানুষ মনে করবেন, এবং সবাই একত্র হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে ব্রতী হবেন।

ক. বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত তারিখে ?

খ. 'বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস'-বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

গ. উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর ভাষণে বঙ্গাবন্ধুর ভাষণের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'- ভাষণটির সম্পূর্ণভাব ধারণ করে – মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

খাদ্যশস্যের পরেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা হলো এখানকার কুটিরশিল্প। এক সময়ে ঘর-গৃহস্থলির নিত্য ব্যবহারের প্রায় সব পণ্যই এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হতো। আজও অনেক কিছুই হয়। এগুলো কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এ ধরণের সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য।

আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের কতকগুলো এক সময়ে এমন উচ্চমানের ছিল যে, আজও আমরা সেসব জিনিসের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি।

প্রথমে বলতে হয় ঢাকাই মসলিনের কথা। ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকার তাঁতিদের এ অমূল্য সৃষ্টি এক কালে দুনিয়া জুড়ে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন। ঢাকার মসলিন তৎকালীন মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল। মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বোনা হতো যে, ছোট্ট একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে কয়েক শ গজ মসলিন কাপড় প্রবেশ করিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল। শুধু কারিগরি দক্ষতায় নয়, এ ধরনের কাপড় বুনবার জন্য শিল্পীমন থাকাও প্রয়োজন। আজ সেই মসলিন নেই। তবে মসলিন যারা বুনত, তাদের বংশধররা যুগ যুগ ধরে এ শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আমরা আজও দেখতে পাই। বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে শুধু পরিচিতই নয়, গর্বের বস্তু।

এমনি আর একটি গ্রামীণ লোকশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এটি হলো নকশিকাঁথা। এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এ নকশিকাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল। এক একটি সাধারণ আকারের নকশিকাঁথা সেলাই করতেও কমপক্ষে ছয় মাস লাগত। বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া যায় না, এমন মৌসুমই ছিল নকশিকাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময়। মেয়েরা সংসারের কাজ সাঙ্গ করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এ বিচিত্র নকশা তোলা কাঁথা সেলাই করতে। পড়শিরাও সুযোগ পেলে আসত গল্প করতে। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। এমনি এক একটি কাঁথা সেলাই কত গল্প, কত হাসি, কত কান্নার মধ্যে দিয়ে শেষ হতো তা বলা যায় না। শুধু কতকগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রং-বেরঙের নকশার জন্যই নকশিকাঁথা বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনী, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা।

আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সব এলাকাতেই আছে: তবে ঢাকা, টাঙ্গাইল, সাজাদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁতশিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি। নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামেই জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এ এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতের তাঁতিদের তাঁতশিল্পই নয়, বর্তমানের বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে।

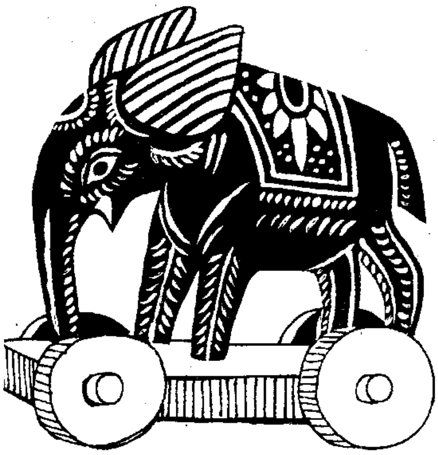

কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রামজীবনেই নয়, শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে। খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর সবটাই হাতে প্রস্তুত। তুলা থেকে হাতে সুতা কাটা হয়। গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে সুতা কাটে। এদের বলা হয় কাটুনি। গ্রামে বাড়ির আশেপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে। সেই গাছের তুলা দিয়ে সুতা কাটা ও হ চালিত তাঁতে এসব সুতায় যে কাপড় প্রস্তুত করা হয়, সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় ব্যবহারের যে আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই সাফল্যের সাক্ষর এই খাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরী মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। নকশা, রং ও বুননকৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আজও শত শত গ্রাম্য কারিগর তৈরি করে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র। প্রথমে মাটির ছাঁচ করে তার মধ্যে ঢেলে দেয় গলিত কাঁসা। ধীরে ধীরে এ গলিত ধাতু ঠান্ডা হয়ে আসে। তখন ওপর থেকে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেললেই ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা ইত্যাদি। তারপর এগুলো পালিশ করা হয়। এ ধরনের বাসনে নানারকম ফুল পাতার নকশা বা ফরমাশকারীর নাম খোদাই করা থাকে। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে তামা-পিতলের ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এদেশে বহু যুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, রসের

ঠিলা, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল, হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদির মূর্তি গড়বার কাজে বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমোরপাড়ার অধিবাসীরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট, কৌটা, বাক্স বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সব কিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের গায়ে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায় তা এদেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

প্রতীকধর্মী মাটির টেপা পুতুলগুলোর মধ্যে শত শত বছর পূর্বের পাল বা কুমোরদের যে কারিগরিবিদ্যা এবং শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অভাবনীয়।

কাঠের কাজের খুব বেশি শিল্পগুণ আজকাল দেখা না গেলেও অতীতের কিছু কিছু নমুনা যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ দেশে এক সময় গৃহনির্মাণের কাজে কারুকার্যে ভূষিত কাঠের ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে পুরাতন খাট-পালঙ্ক, খুঁটি-দরজা ইত্যাদির নমুনা আজও দেখা যায়। এ ধরনের কাজকে বলা হয় হাসিয়া। বরিশালের কাঠের নৌকার কাজও বেশ নিপুণতার দাবি রাখে।

খুলনার মাদুর এবং সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। এ শিল্পীদের দিয়ে এককালে ঢাকার নবাব পরিবার হাতির দাঁতের শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকার জাদুঘরে তা সংরক্ষিত আছে। এটি আমাদের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা, হাতপাখা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। এদের বিচিত্র নকশা, রং এবং কারিগরি সৌন্দর্যের যে নিদর্শন চোখে পড়ে তা শুধু আমাদের অতি আপন বস্তুই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এদের স্থান বহু উচ্চে। সাধারণ সামগ্রী হলেও যাঁরা এগুলো তৈরি করেন তাঁদের সৌন্দর্য প্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্য দিয়ে। শিকা গৃহস্থালির জিনিসপত্তর ঝুলিয়ে রাখার জন্য তৈরি, একথা সকলেই জানে। শুধু শুধু প্রয়োজন মিটলেই মন ভরে না বলে সৌন্দর্য প্রিয় মানুষ নানা নকশা জুড়ে দিয়ে তাকেও একটি বিশেষ শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছে।

আমাদের দেশে বাঁশ অপ্রতুল নয়। বাঁশের নানারকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না। ছোটখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক রুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া সোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনাও দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে।

কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। অবশ্য আজকাল বাস্তবধর্মী কাপড়ের পুতুল তৈরিও শুরু হয়েছে। এগুলো যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশি পয়সাও উপার্জন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

আমাদের সকলকেই আজ আপন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির দিকে শুধু চোখ দিয়ে তাকালে হবে না, হৃদয় দিয়েও তাকাতে হবে। লোকশিল্পের ভিতর দিয়ে হৃদয়-মনের প্রকাশ হলে তা বিদেশিদের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে। এভাবে দেশে দেশে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজেও আমাদের লোকশিল্প সাহায্য করতে পারে।

শব্দার্থ ও টীকা

নিবিড় — ঘনিষ্ঠ

পণ্য — বিক্রি করা যায় এমন জিনিস।

লোকশিল্প — দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্পসম্মত দ্রব্য।

অমূল্য — মূল্য দিয়ে যার বিচার করা যায় না।

অপ্রতুল — যথেষ্ট নয়।

দক্ষতা — নিপুণতা, কুশলতা।

লুপ্তপ্রায় — লোপ পেতে বসেছে এমন।

রেওয়াজ — রীতি, পদ্ধতি, ধরন।

অনুপ্রেরণা — উদ্দীপনা, উৎসাহ।

জীবনকথা — জীবনের কাহিনী।

অপরিহার্য — যা এড়ানো যায় না, আবশ্যিক।

মণিপুরী — মণিপুর-সম্পর্কিত, মণিপুরে উৎপন্ন।

প্রতীকধর্মী — নিদর্শনজ্ঞাপন, সংকেত।

টোপর — হিন্দু সম্প্রদায়ের বরের মাথার মুকুট।

টেকসই — মজবুত।

ঐতিহ্য — অতীতের গর্ব ও গৌরবের বস্তু।

সংরক্ষণ — বিশেষভাবে রক্ষা করা।

সম্প্রসারণ — প্রসারিত করা, বিস্তার করা।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। তারা দেশের লোকশিল্প সম্পর্কে আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তা সংরক্ষণে তৎপর হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধটি 'আমাদের লোককৃষ্টি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনায় লোকশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচয় রয়েছে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য অধিকাংশ জিনিসই এ কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের শিল্পকে লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

পূর্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত লোকশিল্পের দ্রব্য তৈরি হতো তার অনেকগুলোই অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। ঢাকাই মসলিন তার অন্যতম। ঢাকাই মসলিন অধুনা বিলুপ্ত হলেও ঢাকাই জামদানি শাড়ি অনেকাংশে সে স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে পরিচিত এবং আমাদের গর্বের বস্তু।

নকশি কাঁথা আমাদের একটি গ্রামীণ লোকশিল্প। এ শিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও এর কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনী, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা। আমাদের দেশের কুমোরপাড়ার শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র ছাড়াও পোড়ামাটি দিয়ে নানা প্রকার শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে থাকে। নানা প্রকার পুতুল, মূর্তি ও আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট ইত্যাদি তারা গড়ে থাকে। খুলনার মাদুর ও সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত।

আমাদের দেশের এই যে লোকশিল্প তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। লোকশিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি।

লেখক-পরিচিতি

কামরুল হাসান ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। একজন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে দেশে-বিদেশে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর আঁকা ছবিতে এদেশের লোকজ জীবনের নানা উপাদান আমাদের ঐতিহ্য-সচেতন করে। লোকশিল্প সংরক্ষণেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ডিজাইন সেন্টারের প্রধান (নকশাবিদ) নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকশিল্পের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেন। ছবি আঁকার বিচিত্র কলাকৌশল এবং লোকশিল্পের নানা দিক সম্পর্কে তাঁর লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর একটি বইয়ের নাম 'বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা'। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি কামরুল হাসান ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকায় তোমার দেখা কয়েকটি লোকশিল্পের পরিচয় তুলে ধর (একক কাজ)।

খ. তোমার দেখা কোনো লোকশিল্প মেলার বিবরণ দিয়ে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল ?

ক. নকশিকাঁথা　　খ. ঢাকাই মসলিন

গ. খদ্দরের কাপড়　　ঘ. শীতলপাটি

২. মসলিনের কারিগরদের বংশধরেরা আজও কোথায় বসবাস করছে?

ক. কুমিল্লা খ. সিলেট

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. নারায়ণগঞ্জ

৩. মসলিনের ঐতিহ্য লালন করছে কোনটি ?

ক. নকশিকাঁথা খ. জামদানি শাড়ি

গ. টেরাপুতুল ঘ. শীতলপাটি

৪. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

কামাল তার বন্ধুর জন্মদিনে উপহার দিল একটি পিতলের কলস। এতে অনেকেই তাকে নিয়ে উপহাস করলেও অতীতে দুনিয়া জুড়ে আমাদের কারিগরদের কাজের উচ্চমানের কথা মনে করে কামাল গর্ববোধ করছিল। কামালের দেয়া উপহারটিকে শিল্পগুণ বিচারে কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায় ?

ক. আধুনিক শিল্প খ. কুটির শিল্প

গ. চারু শিল্প ঘ. মৃৎ শিল্প

৫. এরূপ উপহার দেয়ার পেছনে কামালের উদ্দেশ্যকে 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়–

i. অর্থ সাশ্রয় করা

ii. লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা

iii. ঐতিহ্যকে ধরে রাখা

কোনটি সঠিক উত্তর?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পলাশপুর গ্রামের রহিমা। দরিদ্র হলেও শিল্পী মনের অধিকারী। ছোটবেলা থেকেই সে বাঁশ, বেত দিয়ে সংসারে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তৈরি করতো। কিন্তু আচমকা একদিন তার স্বামী মারা গেলে দুই সন্তান নিয়ে পথে বসে রহিমা। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে সুঁই-সুতা হাতে তুলে নেয় সে। তার সুখ-দুঃখের জীবনালেখ্য রহিমার দীঘল সুতার টানে ভাষা দিতে থাকে। একদিন বেসরকারি একটি সংস্থার মাধ্যমে তার সুচিশিল্পগুলো যায় বিদেশে এবং মোটা অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তির পাশাপাশি প্রচুর সুনাম অর্জন করে।

ক. কোন এলাকার 'মাদুর' সকলের কাছে পরিচিত ?

খ. 'ঢাকাই মসলিনের কদর ছিল দুনিয়া জুড়ে'—বলতে কী বোঝায় ?

গ. স্বামীর মৃত্যুর পর রহিমার কাজটি 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধে কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? বর্ণনা কর।

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমার অবদান 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. সেঁজুতির স্কুলে চলছিল বার্ষিক লোকশিল্প মেলা। সেঁজুতি জমা দেয় একটা নকশিকাঁথা। এ কাঁথায় – ফুটিয়ে তোলে বর্ষা-প্রকৃতি এবং বিরহকাতর একজন নারীর জীবনগাথা। দর্শনার্থী, বিচারক এবং প্রতিযোগী সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখেন এটি। একজন মন্তব্য লেখেন, আমাদের লোক শিল্প যে সমৃদ্ধ তা বলে শেষ করার মতো নয়। কিন্তু সময় ও রুচির পরিবর্তনে তা আজ প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের সকলের এখনই এর প্রতি নজর দেয়া উচিত। নইলে অচিরেই এ শিল্প ধারাকে আমরা হারাব।

ক. শিল্পগুণ বিচারে আমাদের কুটিরশিল্প কোন শিল্পের মধ্যে পড়ে?

খ. বর্ষাকালে নকশি কাঁথা তৈরির জন্য উপযুক্ত সময় কেন ?

গ. সেঁজুতির এহেন উদ্যোগ আমাদের লোকশিল্পের যে বিশেষ দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে লোকশিল্প বাঁচিয়ে রাখার যে তাগিদ অনুভূত হয়েছে তা 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের লেখকের বক্তব্যকে সমর্থন করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

সুখী মানুষ

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ

চরিত্রলিপি

নাম	বয়স
মোড়ল	৫০
কবিরাজ	৬০
হাসু	৪৫
রহমত	২০
লোক	৪০

[মোড়লের অসুখ। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কবিরাজ মোড়লের নাড়ি পরীক্ষা করছে। মোড়লের আত্মীয় হাসু মিয়া আর মোড়লের বিশ্বাসী চাকর রহমত আলী অসুখ নিয়ে কথা বলছে।]

হাসু : রহমত, ও রহমত আলী।

রহমত : শুনছি।

হাসু : ভালো করে শোনো, ঐ কবিরাজ যতই নাড়ি দেখুক, তোমার মোড়লের নিস্তার নাই।

রহমত : অমন ভয় দেখাবেন না। তাহলে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লেগে যাব।

হাসু : কাঁদ, মন উজাড় করে কাঁদ। তোমার মোড়ল একটা কঠিন লোক। আমাদের সুবর্ণপুরের মানুষকে বড় জ্বালিয়েছে। এর গরু কেড়ে, তার ধান লুট করে তোমার মোড়ল আজ ধনী। মানুষের কান্না দেখলে হাসে।

রহমত : তাই বলে মোড়লের ব্যারাম ভালো হবে না কেন?

হাসু : হবেই না তো। মোড়ল যে অত্যাচারী, পাপী। মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না। দেখে নিও, মোড়ল মরবে।

রহমত : আর আজে-বাজে কথা বলবেন না। আপনি বাড়ি যান!

কবিরাজ : এত কোলাহল করো না। আমি রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছি।

রহমত : ও কবিরাজ, নাড়ি কী বলছে! মোড়ল বাঁচবে তো!

কবিরাজ : মূর্খের মতো কথা বল না। মানুষ এবং প্রাণী অমর নয়। আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে তাই শ্রবণ কর।

হাসু : আমাকে বলুন। মোড়ল আমার মামাতো ভাই।

রহমত : মোড়ল আমার মনিব।

কবিরাজ : এই নিষ্ঠুর মোড়লকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে একটি কঠিন কর্ম করতে হবে।

হাসু : বাঘের চোখ আনতে হবে?

কবিরাজ : আরও কঠিন কাজ।

রহমত : হিমালয় পাহাড় তুলে আনব?

কবিরাজ : পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্র, নক্ষত্র কিছুই আনতে হবে না।

মোড়ল : আর সহ্য করতে পারছি না। জ্বলে গেল। হাড় ভেঙে গেল। আমাকে বাঁচাও।

কবিরাজ : শান্ত হও। ও রহমত, মোড়লের মুখে শরবত ঢেলে দাও।

(রহমত মোড়লকে শরবত দিচ্ছে।)

হাসু : ঐ মোড়ল জোর করে আমার মুরগি জবাই করে খেয়েছে। আমি আজ মুরগির দাম নিয়ে ছাড়ব।

মোড়ল : ভাই হাসু এদিকে এস, আমি সব দিয়ে দেব। আমাকে শান্তি এনে দাও।

কবিরাজ : মোড়ল, তুমি কী আর কোনো দিন মিথ্যা কথা বলবে?

মোড়ল : আর বলব না। এই তোমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিন মানুষের ওপর জবরদস্তি করব না। আমাকে ভালো করে দাও।

কবিরাজ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর কোনোদিন লোভ করবে?

মোড়ল : না। লোভ করব না, অত্যাচার করব না আমাকে শান্তি দাও। সুখ দাও।

কবিরাজ : তাহলে মনের সুখে শুয়ে থাক, আমি ওষুধের কথা চিন্তা করি।

মোড়ল : সুখ কোথায় পাব? আমাকে সুখ এনে দাও।

হাসু : অন্যের মনে দুঃখ দিলে কোনোদিন সুখ পাবে না।

মোড়ল : আমার কত টাকা, কত বড় বাড়ি! আমার মনে দুঃখ কেন?

কবিরাজ : চুপ কর। যত কোলাহল করবে তত দুঃখ বাড়বে। হাসু এদিকে এস, আমার কথা শ্রবণ কর। মোড়লের ব্যামো ভালো হতে পারে, যদি.....

রহমত : যদি কী?

কবিরাজ : যদি আজ রাত্রির মধ্যেই—

হাসু : কী করতে হবে?

কবিরাজ : যদি একটি ফতুয়া সংগ্রহ করতে পার।

রহমত : ফতুয়া?

কবিরাজ : হ্যাঁ, জামা। এই জামা হবে একজন সুখী মানুষের। তার জামাটা মোড়লের গায়ে দিলে, তৎক্ষণাৎ তার হাড় মড়মড় রোগ ভালো হবে।

রহমত : এ তো খুব সোজা ওষুধ।

কবিরাজ : সোজা নয়, খুব কঠিন কাজ। যাও, সুখী মানুষকে খুঁজে দেখ। সুখী মানুষের জামা না হলে অসুখী মোড়ল বাঁচবে না।

মোড়ল : আমি বাঁচব। জামা এনে দাও, হাজার টাকা বখশিশ দেব।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

[বনের ধারে অন্ধকার রাত। চাঁদের ম্লান আলো। ছোট একটি কুঁড়েঘরের সামনে হাসু মিয়া ও রহমত গালে হাত দিয়ে ভাবছে।]

রহমত : কী তাজ্জব কথা, পাঁচ গ্রামে একজনও সুখী মানুষ পেলাম না। যাকেই ধরি, সেই বলে, না ভাই, আমি সুখী নই।

হাসু : আর তো সময় নাই ভাই, এখন বারটা। সুখী মানুষ নাই, সুখী মানুষের জামাও নাই। মোড়ল তো তাহলে এবার মরবে।

রহমত : আহা রে, আমরা এখন কী করব! কোথায় একটা মানুষ পাব, যে কিনা—

হাসু : পাওয়া যাবে না। সুখী মানুষ পাওয়া যাবে না। সুখ বড় কঠিন জিনিস। এ দুনিয়াতে ধনী বলছে, আরও ধন দাও; ভিখারী বলছে, আরও ভিক্ষা দাও; পেটুক বলছে, আরও খাবার দাও। শুধু দাও আর দাও। সবাই অসুখী। কারও সুখ নেই।

রহমত : আমরাও বলছি, মোড়লের জন্য জামা দাও, আমাদের বখশিশ দাও। আমরাও অসুখী।

হাসু : চুপ চুপ! ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে।

রহমত : ভূত নাকি? চলেন, পালিয়ে যাই। ধরতে পারলে মাছভাজা করে খাবে।

হাসু : এই যে, ভাই। ঘরের মধ্যে কে কথা বলছ? বেরিয়ে এস।

রহমত : ভূতকে ডাকবেন না।

[ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো।]

লোক : তোমরা কে ভাই? কী চাও?

হাসু : আমরা খুব দুঃখী মানুষ। তুমি কে?

লোক : আমি একজন সুখী মানুষ।

হাসু : আঁ! তোমার কোনো দুঃখ নাই?

লোক : না। সারা দিন বনে বনে কাঠ কাটি। সেই কাঠ বাজারে বেচি। যা পাই, তাই দিয়ে চাল কিনি, ডাল কিনি। মনের সুখে খেয়ে- দেয়ে গান গাইতে গাইতে শুয়ে পড়ি। এক ঘুমেই রাত কাবার।
হাসু : বনের মধ্যে একলা ঘরে তোমার ভয় করে না? যদি চোর আসে?
লোক : চোর আমার কী চুরি করবে?
হাসু : তোমার সোনাদানা, জামাজুতা?

(লোকটি প্রাণখোলা হাসি হাসছে)

রহমত : হা হা করে পাগলের মতো হাসছ কেন ভাই!
লোক : তোমাদের কথা শুনে হাসছি। চোরকে তখন বলব, নিয়ে যাও, আমার যা কিছু আছে নিয়ে যাও।
হাসু : তুমি তাহলে সত্যিই সুখী মানুষ।
লোক : দুনিয়াতে আমার মতো সুখী কে? আমি সুখের রাজা। আমি মস্ত বড় বাদশা।
রহমত : ও বাদশা ভাই, তোমার গায়ের জামা কোথায়? ঘরের মধ্যে রেখেছ? তোমাকে একশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস।
লোক : জামা!
রহমত : জামা মানে জামা! এই যে, আমাদের এই জামার মতো জিনিস। তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস, মোড়লের খুব কষ্ট হচ্ছে।
লোক : আমার তো কোনো জামা নাই ভাই!
হাসু : মিছে কথা বল না।
লোক : মিছে বলব কেন? আমার ঘরে কিছু নাই। সেই জন্যই তো আমি সুখী মানুষ।

শব্দার্থ ও টীকা

কবিরাজ — বৈদ্য। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে যিনি চিকিৎসা করেন।
নাড়ি পরীক্ষা — কবজির নাড়ির অবস্থা দেখে রোগ নির্ণয়।
মূর্খ — নির্বোধ। বোকা। অজ্ঞ।
শ্রবণ — কানে শোনা।
জবরদস্তি — জোরাজুরি।
ব্যামো — অসুখ। রোগ। ব্যারাম।
তাজ্জব — অদ্ভুত। বিস্ময়কর।
প্রাণখোলা — অকৃত্রিম। উদার। খোলা মনের।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ নাটিকা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে যে, অন্যায় ও অনৈতিকভাবে উপার্জিত অর্থ-বিত্তই মানুষের অশান্তির মূল কারণ। বরং সৎ পথে নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করলেই জীবনে শান্তি মেলে। সুতরাং নীতিহীন পথে সম্পদ উপার্জনের পথ পরিহার করাই উত্তম।

পাঠ-পরিচিতি

'সুখী মানুষ' মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের একটি নাটিকা। এর দুটি মাত্র দৃশ্য। নাটিকাটির কাহিনীতে আছে, মানুষকে ঠকিয়ে, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে, ধনী হওয়া এক মোড়লের জীবনে শান্তি নেই। চিকিৎসক বলেছেন, কোনো সুখী মানুষের জামা গায়ে দিলে মোড়লের অসুস্থতা কেটে যাবে। কিন্তু পাঁচ গ্রাম খুঁজেও একজন সুখী মানুষ পাওয়া গেল না। শেষে

একজনকে পাওয়া গেল, যে নিজের শ্রমে উপার্জিত আয় দিয়ে কোনোভাবে জীবিকানির্বাহ করে সুখে দিনাতিপাত করছে। তার কোনো সম্পদ নেই, ফলে চোরের ভয় নেই। সুতরাং শান্তিতে ঘুমোনোর ব্যাপারে তার কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। শেষ পর্যন্ত সুখী মানুষ একজন পাওয়া গেলেও দেখা গেল তার কোনো জামা নেই। সুতরাং মোড়লের সমস্যার সমাধান হলো না। লেখকের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তা হলো, সম্পদই অশান্তির কারণ। সুখ একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। একজনের অনেক সম্পদ থেকেও সুখ নেই। আবার আরেকজনের কিছু না থাকলেও সে সুখী থাকতে পারে।

লেখক-পরিচিতি

মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা শেষে ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা হিসেবে তিনি বাংলাদেশে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—নাটক : 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'রাজা অনুস্বারের পালা', 'সাত ঘাটের কানাকড়ি', 'আমাদের শহর', 'হাস্য লাস্য ভাষ্য'; প্রবন্ধ-গবেষণা : 'বাংলাদেশের নাটকের ইতিবৃত্ত', 'বাংলাদেশের থিয়েটারের ইতিবৃত্ত' ইত্যাদি। এছাড়া তিনি লিখেছেন গল্প, উপন্যাস ও সরস রচনা। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'অর্থ-ঐশ্বর্যই সুখের একমাত্র নিয়ামক'—এ বিষয় অবলম্বনে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।

খ. তোমার আশেপাশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত অবলম্বনে 'সুখ' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সুখী মানুষ' নাটিকার দৃশ্যসংখ্যা কত ?

ক. এক খ. দুই

গ. তিন ঘ. চার

২। 'সুখী মানুষ' নাটিকার মোট চরিত্র সংখ্যা কত ?

ক. পাঁচ খ. ছয়

গ. সাত ঘ. আট

৩। 'মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না'—এ কথার অর্থ কী ?

ক. মনের পবিত্রতা সুস্থতার পূর্বশর্ত খ. প্রকৃত সুখ মোহমুক্তির মধ্যে

গ. নির্লোভ হলে সুস্থ থাকা যায় ঘ. কৃপণতাই ধনীদের মূল অসুখ

৪. 'সম্পদই অশান্তির মূল কারণ'—এ উক্তির ভাবগত সংগতি আছে কোনটির সঙ্গে ?

ক. অপচয় করনা, অভাবে পড়না খ. লাভের ধন পিঁপড়ায় খায়

গ. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ঘ. অতি লোভে তাঁতী নষ্ট

নিচের উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

একজন লোকের অনন্ত ক্ষুধা। সে যা পায় তাই খায়। রেশনের চাল, গম, রিলিফের লোটাবাটি কম্বল। খায় রেলগাড়ি পর্যন্ত। বদ হজম না হয়ে যায় কোথায় ? ভারমুক্ত হবার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু হাজার মানুষের দীর্ঘশ্বাসের বদ প্রভাব যে তার ওপর। পেট কাটা ছাড়া উপায় নেই। আঁৎকে ওঠে লোকটি।

৫. লোকটিকে কার সাথে তুলনা করা যায় ?

ক. রহমানের খ. মোড়লের

গ. হাসুর ঘ. কবিরাজের

৬. তুলনাটা এ কারণে যে তারা উভয়ই—

i. পরধন অপহরণকারী

ii. নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত

iii. নির্দয় ও মানবপ্রেম শূন্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক দুটি পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

১. জোবেদ আলী ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য। এই নিয়ে টানা পঞ্চম বারের মত তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন। হবেনই– বা নয় কেন ? এলাকার মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে সুস্থ না হওয়া অবধি তিনি তার শয্যা ছাড়েন না। সমস্যায় পড়লে সমাধান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার মুখে অন্ন রোচে না। সেই তার অসুখ হলে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করল—আল্লাহ, তুমি আমাদের জোবেদ ভাইকে সুস্থ করে দাও।

ক. আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে যারা চিকিৎসা করে তাদের কী বলে ?

খ. হাসু মোড়লের মৃত্যুকামনা করে কেন ?

গ. জোবেদ আলীর সঙ্গে 'সুখী মানুষে'র যে মিল আছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মোড়ল যদি জোবেদ আলীর মতো হতেন তাহলে তার চিকিৎসার জন্য সুখী মানুষের জামা তালাশ করতে হতো না'।—বিশ্লেষণ কর।

২. সেলিম সাহেব নানা উপায়ে নানা পন্থায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়ার মতো ইদানিং বিভিন্ন অজুহাতে সে পাহাড়ের বিরাট বিরাট অংশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। রাতে দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না। তার মনে হচ্ছে যাকে তিনি এক সময় সুখের উৎস ভেবে ছিলেন তাই হয়ে উঠেছে এখন অসুখের মূল কারণ। ভাঙন যেভাবে লেগেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাবে।

ক. নাট্যকার মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ-এর পেশাগত পরিচয় কী ?

খ. হাসু মোড়লের ফুপাত ভাই হওয়া সত্ত্বেও তার অকল্যাণ কামনা করে কেন ?

গ. মোড়ল চরিত্রের সঙ্গে সেলিম সাহেবের চরিত্রের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মোড়ল আর সেলিম সাহেবের অসুখের মূল কারণ অভিন্ন সূত্রে গাঁথা'।—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

শিল্পকলার নানা দিক

মুস্তাফা মনোয়ার

'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের এই কথাগুলিতে শিল্পকলার মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে। সব মানুষই জীবনের এই আনন্দকে পাওয়ার জন্যে কত রকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায়—নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আঙ্গিকের শিল্পকলা। যেমন—চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা, সংগীতকলা, অভিনয়কলা, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি কলাভঙ্গি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ তার নিত্যনতুন অবদান রেখে চলেছে। শিল্পকলার বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। শিল্পকলার একটি অস্পষ্ট অর্থ আমরা বুঝতে পারি কিন্তু শিল্পকলার সঠিক অর্থ কী আর শিল্পকলার গুণাগুণ কী, এই প্রশ্ন যদি কেউ করে, তাহলে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন গান শুনে ভালো লাগে, ছবি দেখে ভালো লাগে, কিন্তু ভালো লাগে কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মন চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলো। দেখা গেল, সকল শিল্পকলায় রূপ আছে, ছন্দ আছে, সুর আছে, রং আছে, বিশেষ গড়ন আছে, সবকিছুকে সাজাবার একটি সুবিন্যস্ত নিয়ম আছে। এই নিয়মটি লুকিয়ে থাকে, নিজেকে প্রকাশ করে না, সুন্দরের মধ্যে মিলেমিশে একটা বন্ধন সৃষ্টি করে। নিয়মটি না জানলেও সুন্দরকে চেনা যায়। একটি উপমা দেয়া যাক। পৃথিবীর সব ফুলই একই নিয়ম মেনে ফুল নাম পেয়েছে। আমরা দেখে বলি সুন্দর। এর নিয়মটি হলো, একই বিন্দু থেকে সকল পাপড়ি বিন্দুর চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে। কিন্তু এক নিয়ম মেনেই কত রকম ফুল। নিয়ম মেনেও ফুল স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠে। তোমাদের এখন সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না, সুন্দর লাগলেই সুন্দর বলবে। সুন্দর দেখতে দেখতেই একদিন সুন্দরের বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি জানতে পারবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, সুন্দরকে জানার যে জ্ঞান তার নাম **'নন্দনতত্ত্ব'**। নন্দনতত্ত্ব মানে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করা, সুন্দরকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সব সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যেই একটা রূপ আছে, তার নাম স্বাধীনতা—অপর নাম যা খুশি তাই করা। যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে, তাই সুন্দর। স্বার্থপর বা অসংগত আমির খুশি নয়, অনেক মনে খুশির বিস্তার করা আমি। অন্ধকার ঘর আলোকিত করবার জন্যে নিয়ম মেনে প্রদীপ জ্বালাতে হয়, ঘরে অসংগত আগুন লাগিয়ে ঘর আলোকিত করা নয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, কত রকম জিনিস প্রয়োজন হয়—ঘটি, বাটি থেকে বিছানা পত্র। শুধু প্রয়োজন মিটলেই মানুষ খুশি হয় না—মানুষের মন বলে, প্রয়োজন মিটলেই হবে না তাকে সুন্দর হতে হবে। যেমন নকশিকাঁথা, রাত্রে বিছানায় গায়ে দিয়ে শোওয়ার জন্য একটি সামগ্রী—সেটা তো সুন্দর-অসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই প্রয়োজনের জিনিসকে সুই আর রঙিন সুতা দিয়ে অপূর্ব নকশা করে সাজিয়েছে গাঁয়ের বধূরা। নকশিকাঁথা দেখলেই সুন্দর লাগে, জিনিসটির প্রয়োজনের কথা মনেই পড়ে না। এ কারণেই সকল জ্ঞানী মানুষ বলেন, সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে। প্রয়োজনের কাজ মিটল তো শরীরকে তৃপ্ত করল, আর প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে তৃপ্ত করল। অর্থাৎ প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলিয়েই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয়।

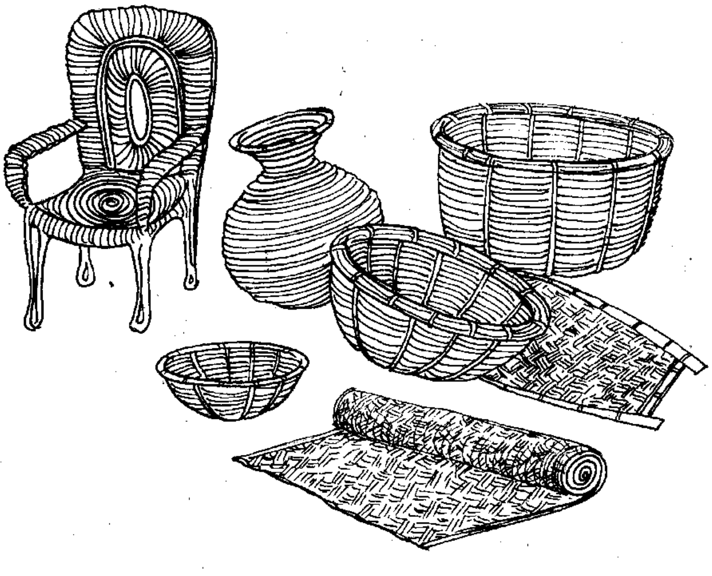

এবার বিভিন্ন শিল্পকলা নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে কিছু বলা যাক। ছবি আঁকা। বিশ্বের সকল দেশেই শিশুরা ছবি আঁকে। বাংলাদেশের ছোটরাও খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। ছবি আঁকা মানে 'দেখা শেখা'। ছোটরা প্রকৃতিকে দেখে, মা-বাবা, ভাই-বোন মিলিয়ে একটা সমাজকে দেখে। প্রতিদিনের দেখা বিষয়বস্তু, রং, গড়ন, আকৃতি শিশুমনের কল্পনার সঙ্গে মিলেমিশে যায়। নানা রকম গল্প শুনে দেশের কথা শুনে, কবিতা ছড়া শুনেও শিশুমনে ছবি তৈরি হতে থাকে। এ সকল দেখা-অদেখা বস্তু নিয়ে শিশুরা ছবি আঁকে কল্পনা-বাস্তব মিলিয়ে। নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে শেখে।

সকল শিল্পকলার মধ্যে কতকগুলি মূল বস্তু থাকে যেমন—বিন্দু, রেখা, রং, আকার, গতি বা ছন্দ, আলোছায়া গাঢ়-হালকার সম্পর্ক ইত্যাদি। এই সকলের মিলনেই হয় ছবি বা ভাস্কর্য। আর আছে মাধ্যম, অর্থাৎ কোন মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। চিত্রকলার মাধ্যম হলো কালি-কলম, জল রং, প্যাস্টেল রং, তেল মিশ্রিত রং ইত্যাদি। ছোটদের জন্য প্যাস্টেল ও জল রং ব্যবহার করা সহজ হয়। বাংলাদেশে পুরাকালে জল রং দিয়েই ছবি আঁকত শিল্পীরা। পুরাতন পুঁথিতে তালপাতায় আঁকা ছবির বহু নিদর্শন আছে। বর্তমানেও জল রং অত্যন্ত প্রিয়, তবে এখন আর কেউ তালপাতায় আঁকে না, কাগজে আঁকে।

ভাস্কর্য। নরম মাটি দিয়ে কোনো কিছুর রূপ দেয়া বা শক্ত পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানো। বিশেষ এক ধরনের ছাঁচ বানিয়ে গলিত মেটাল ঢেলে গড়ন বানানো, এই ধরনের কাজকে বলে ভাস্কর্য। আমাদের দেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে নানান শিল্পকলার কারুকাজ দিয়ে। সকল শিল্পীর একটি দায়িত্ব আছে-দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা। বাংলায় একটি কথা আছে—'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'—কালি মানে দেশের ঐতিহ্যে হাজার বছর প্রবাহিত কালি, কলম হলো শিল্পসৃষ্টির বর্তমান সরঞ্জাম, আর মন হলো বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐতিহ্যের মিল করে নিজেকে প্রকাশ করার মন। একটি দেশকে জানা যায় দেশের মানুষকে জানা যায় তার শিল্পকলা চর্চার ধারা দেখে। শিল্পকলা চর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য।

শব্দার্থ ও টীকা

ভুবন — পৃথিবী, জগৎ, ভূমন্ডল।

শিল্পকলা — চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাচ, গান প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত।

রস — সাহিত্য পাঠ করে বা ছবি দেখে মনে যে অনুভূতি জাগে।

পুরাকাল — প্রাচীনকাল, অনেক আগেকার সময়।

গুহা-মানুষ — প্রাচীনকালে গুহায় বসবাসকারী মানুষ।

ভাস্কর্য — ইংরেজিতে বলে স্কাল্পচার (Sculpture)। পাথর খোদাই করে বা মাটি দিয়ে আকার বা গড়ন নির্মাণের কাজ।

স্থাপত্য — গৃহ বা ভবনাদি নির্মাণের কাজ। ইংরেজিতে বলে আর্কিটেক্সার।

প্রাত্যহিক জীবন — প্রতিদিনের জীবন।

নকশি কাঁথা — সুন্দর নকশা সৃষ্টি করে তৈরি কাঁথা। বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটি সমৃদ্ধ শাখা।

গড়ন — আকার, আকৃতি, রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে ফর্ম। এ রচনায় শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হবে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্পর্কে তারা আগ্রহী হবে। তারা নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

এই রচনাটিতে লেখক সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা, সবকিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতিজগতে সুন্দরের প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। তা দেখে মানুষ নতুন করে সুন্দরকে সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মাধ্যমে চলে সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া। কখনো রেখার সাহায্যে, কখনো রঙের সাহায্যে, কখনো মাটি বা পাথরের সাহায্যে সুন্দরকে সৃষ্টি করা হয়। সুন্দর বোধ মানুষের মনকে তৃপ্ত করে। মানুষকে তা পরিশীলিত করে। সুন্দরের সৃষ্টিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

লেখক–পরিচিতি

মুস্তাফা মনোয়ার একজন চিত্রশিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর পিতা। তিনি কলকাতা আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র। ঢাকায় চারুকলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও শিল্পকলা একাডেমীতে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে পাপেট থিয়েটার ও অ্যানিমেশন শিল্পকলায় আধুনিকতা প্রচলনে তিনি অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া 'মনের কথা' নামে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘকাল শিশুদের উপযোগী শিল্পকলাবিষয়ক একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। ১৯৭২ সাল থেকে প্রচারিত শিশু প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বহুল জনপ্রিয় 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানের রূপকার তিনি। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান প্রযোজনায় তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশিষ্ট নৃত্য পরিকল্পনাকারী, সংগীত পরিচালক, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সাফ গেমসের সফল মাসকট নির্মাতা তিনি। একুশে পদকসহ বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি।

কর্ম-অনুশীলন

ক. সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।
খ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।
গ. বাস্তবে বা ছবিতে দেখা তোমার ভালো লাগা কোনো একটি আলোকচিত্র বা ভাস্কর্য বা স্থাপত্য সম্পর্কে তিন-চার অনুচ্ছেদের একটি রচনা লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মুস্তাফা মনোয়ার হলেন একজন—
ক. চিত্রশিল্পী খ. ভাস্কর্যশিল্পী
গ. স্থাপত্যশিল্পী ঘ. কারুশিল্পী

২. কোনটির মধ্য দিয়ে একটি দেশ এবং দেশের মানুষকে জানা যায় ?
ক. শিল্পকলা চর্চা খ. সাহিত্যচর্চা
গ. বিজ্ঞানচর্চা ঘ. চিত্রকলা চর্চা

৩। 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?
i. প্রয়োজনের মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না
ii. অপ্রয়োজনীয় অংশই কেবল মানব মনকে তৃপ্ত করে
iii. প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ফায়েজ আহমেদ কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স পড়ছেন, সারাক্ষণ তার রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে কম্পিউটার নিয়ে তিনি বসে থাকেন। ছোট বোন ফাহিমা পূর্ণিমার রাতে ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখতে বললে সে বলে—ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখার কী আছে, জানালা দিয়েই তো চাঁদ দেখা যায়। সে সব সময় মুখটা কেমন গম্ভীর করে বসে থাকে। সবার সাথে মেশেও না।

৪. উদ্দীপকের ফায়েজের মনে কীসের অভাব আছে ?
ক. আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা খ. ভাব ও অনুসন্ধিৎসা
গ. আনন্দ ও অনুভূতি ঘ. আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রাহ

৫. 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে ফায়েজের উক্ত অভাববোধ থাকার কারণ—
ক. শিল্পচর্চার অভাব খ. শিল্পকলার প্রতি অনাসক্তি
গ. সাহিত্যচর্চার অভাব ঘ. প্রকৃতির প্রতি অনাসক্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মেহেরুন্নেসা এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। নবীনবরণ শেষে তিনি বান্ধবীদের সাথে ক্যাম্পাস ঘুরতে ঘুরতে এলেন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে। সেখানে দেখেন—এক হাতে বন্দুক ধরে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার এক ভাস্কর্য। নাম—সংশপ্তক। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যে সম্মুখ পানে এগিয়ে যায় তাকেই বলে সংশপ্তক। ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে এই ভাস্কর্যটি বানানো হয়েছে। মনটা ভরে গেল মেহেরুন্নেসার।

ক. মুস্তাফা মনোয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?
খ. 'প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলেই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ' —কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. ক্যাম্পাসে মেহেরুন্নেসা শিল্পকলার কোন দিকটি দেখেছেন? এর বর্ণনা দাও।
ঘ. 'মেহেরুন্নেসার দেখা দিকটিই শিল্পকলার প্রধান দিক' —মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

২. নন্দলাল বসু তাঁর 'শিল্পকলা' গ্রন্থে বলেছেন—'যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ সৃষ্টি বেশি, তাহাকে আমরা ললিতকলা বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি। আবার যাহাকে আমরা ললিতকলা বলি, তাহাও আরেক দিক হইতে কারুকলা শ্রেণিভুক্ত হইতে পারে। স্থাপত্যবিদ্যাপ্রসূত সুরম্য প্রাসাদকে যখন মানুষের বসবাস উপযোগী করিয়া দেখি তখন তাহা কারুশিল্প। আবার উহাকে যখন রূপময় অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি হিসেবে দেখি তখন তাহা চারুকলা।'

ক. 'পুরাকাল' শব্দের অর্থ কী ?
খ. শিল্পকলা চর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য কেন ?
গ. উদ্দীপকের ললিতকলা বলতে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. চারুকলা ও কারুকলার সমন্বিত রূপ শিল্পকলা—'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

মংডুর পথে

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে, ২৪শে মে, ২০০১, মিয়ানমারের (বার্মার) সীমান্ত শহর মংডুর পথে নেমে আমার মুখ, চোখ, কান ও হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল।

মংডু আমাদের টেকনাফের ওপারে। মাঝখানে নাফ নদী। মংডু বার্মার পশ্চিম সীমান্তের শহর। ব্রিটিশ যুগের বহু আগে থেকেই চট্টগ্রামের সঙ্গে তার যোগাযোগ। কখনও ছিন্ন, কখনও নিরবচ্ছিন্ন। পাদরি মেস্ট্রো সেবাস্টিন মানরিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পথে আসেন। তারও একশ বছর আগে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। তারা নিজেদের বসতির জায়গাকে ব্যান্ডেল বলত। চট্টগ্রামে এখন ব্যান্ডেল রোড তাদের স্মৃতি বহন করছে।

সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে আসার পর আমরা অভিবাসন ও শুল্ক দফতর থেকে ছাড়া পেয়ে খাঁচা-ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলাম। এই পথে আসতে পেরে খুশি হয়েছি, পথে আরাকান পড়বে, আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী ম্রাউক-উ দেখতে পাব। এক সময় আরাকান বার্মা থেকে আলাদা স্বাধীন রাজ্য ছিল। তার পরিধি ছিল উত্তরে ফেনী নদী থেকে আন্দামান সাগরের কাছাকাছি পুরো বঙ্গোপসাগর উপকূল। সেখানে এসে পড়েছি এখন। আরাকান রাজ্যের রাজসভায় দৌলত কাজী, আলাওল সাহিত্যচর্চা করেছেন।

ছেলেবেলা থেকে চট্টগ্রামের পাশে অপরূপ মিয়ানমারের কথা শুনে এসেছি রূপকথার গল্পের মতো, আজ তা বাস্তবে ভেসে উঠল সন্ধ্যের আলোছায়ায়। অন্ধকার প্রায় গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘের কোলে শুক্লপক্ষের চাঁদ। আমার হাতে ও কাঁধে ঝোলাঝুলি। শুল্ক অফিসের চৌহদ্দি পেরিয়ে পঞ্চাশ কদম না যেতেই বাঁ দিকে বড় বড় রেস্তরাঁ, প্রায় জনমানবহীন। ডান দিকে মোড় ঘুরতেই দেখি এক মিয়ানমার কুমারী পানীয়ের পসরা নিয়ে বসেছে। একেবারেই ঝুপড়ি দোকান। কুমারীর দোকানের পাশেই আর একটি সে রকম দোকান। তারপর সামনেই শুরু হয়েছে বাড়িঘর ও দোকান। পথে নেমে পড়েছে তরুণ-তরুণী, মেয়ে-পুরুষ। পথে পথে মিয়ানমারের রঙ্গিলা যুবতী-তরুণীরা। কলহাস্যে মুখর। বাড়ির সামনে, দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ। যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। মিয়ানমারের সবাই লুঙ্গি পরে। মেয়েদের পরনে লুঙ্গি ও ঝলমলে ব্লাউজ জাতীয় জামা বা গেঞ্জি। চুলে ফুল গোঁজা, চিরুনি ও রিবন-ফিতে।

পাশ দিয়ে একটা পাইক্যা চলে যাচ্ছে। তিন চাকার রিকশা, যেমন মোটর বাইকের পাশে আর একটা চাকা লাগিয়ে ক্যারিয়ারে বউ বাচ্চা বসতে পারে, এও প্রায় তেমনি। সারা মিয়ানমারে আমাদের রিকশার বদলে পাইক্যা। স্থানীয় মুসলমানরা এর একচেটিয়া চালক। মংডুর ব্যবসাও প্রায় ওদের দখলে, আর হিন্দুরাও আছে। এরা চট্টগ্রাম থেকে

এসেছে, দীর্ঘদিন ধরে আছে।

ইউনাইটেড হোটেলে পৌঁছলাম, কিন্তু জায়গা হলো না। আগে-ভাগে যারা গেছে তারা জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রায় অনাথের মতো বোঁচকা-বুচকি নিয়ে নতুন হোটেলের উদ্দেশে চললাম। আমরা খুঁজে পেতে যে হোটেল পেলাম তার অবস্থা শোচনীয় বললে কম বলা হয়। বেড়ার ঘরের দোতলার মাঝবারান্দায় বসেই টের পেলাম এটা চতুর্থ শ্রেণির হোটেল হতেও পারে। কাঠের মেঝে। কাঠের যেমন-তেমন দেয়াল। বিছানায় গিয়ে পরখ করে দেখি উঁচু-নিচু চষা জমির মতো তোশক। মশারিতে বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী নানা রকম উৎকট দুর্গন্ধ। মাথার উপরে পাখা আছে। কিন্তু রাত নয়টার পর তো বিজলি থাকবে না। তখন গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার অবস্থা হবে। নিলাম ফ্যান ছাড়া একটি কক্ষ। পরে মনে পড়ল ফ্যান থাকলেই বা কী! আমার তো রাতে ফ্যান সহ্য হয় না। বাতিও থাকবে না রাতে।

মাঝবয়সী সুন্দরী এক রমণী আমাদের প্রায় টেনে নিয়ে গেল তার রয়েল রেস্তরাঁয়, রাতের খাওয়ার জন্য। ইউনাইটেড হোটেলে যারা উঠেছে তারা নাকি ওদিকে এক মুসলিম রেস্তরায় খেয়ে নিচ্ছে। রয়েল রেস্তরাঁ মন্দ নয়। সুন্দর ঝকঝকে টেবিল-টুল। বাসন-কোসন ভদ্র। ভাতের দোকান বলেই উঁচু টেবিল ও প্লাস্টিকের টুল। সম্ভবত চীন থেকে আমদানি ওই টুল। সাধারণ বর্মি রেস্তরায় নিচু টেবিল ও টুল থাকে।

রেস্তরার রাখাইন মালকিনের বয়স প্রথমে বুঝতে পারিনি। বলে কী! ওর বড় ছেলে কলেজে পড়ে! কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে রাখাইন আছে। এখন বুঝতে পারলাম আমার দেশের রাখাইনদের কত কম জানি। তাদের খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। তাহলে কী করে দেশের সব মানুষের সঙ্গে আমার সখ্য নিবিড় হবে।

রান্না ঘর থেকে ছুটে এলো একটি মেয়ে। বাঙালি। লুঙ্গি এবং কোমর-ঢাকা ব্লাউজ পরেছে। মেয়েটি দিব্যি চট্টগ্রামী ভাষায় এটা-ওটা আছে জানিয়ে রাখতে লাগল। ওর নাম ঝরনা। পূর্বপুরুষের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজান। আমার পাশের থানা। ওর মতো আরও একজন বাঙালি মেয়ে রান্নাবান্না করে। চেহারা ও স্বাস্থ্য গরিব ঘরের রোগা-পটকা নারীর মতো।

পোড়া লঙ্কা কচলে নুন-তেল দিয়ে ভর্তা করল। একটা প্লেটে তার সঙ্গে দিল কচি লেবুপাতা। বাহ্। খাস চট্টগ্রামের খাবার। আসলে এদের থেকে চট্টগ্রামের বড়ুয়ারা এই খাবার নিয়েছে। চাকমা মারমারা ধানি লঙ্কা পুড়ে নুন ও পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে। পোড়া বা সেদ্ধ ধানি লঙ্কা কুইজ্যায় বা মাটির হামানদিস্তায় পিষে নেয়। একটা রাত কেটে গেল অখ্যাত বা কুশ্রী হোটেলে।

অজস্র জাতিসত্তার অনতর্মুখী জাতি

২৫শে মে, দ্বিতীয় দিন। মহাথেরোর সঙ্গে মংডুর প্রধান সড়ক ধরে চলেছি। বাজার। দুপাশে বাড়ি, বাড়ির নিচে দোকান। ভেতরের বাড়িগুলো সেগুন কাঠের থাম বা পাকা থামের ওপর। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা পথ। গাছপালার পাতা চকচক করছে ধাতব নতুন টাকার মতো। বৃষ্টি শিরীষ, আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া সবই আমাদের মতো। পদাউকের পাতা লকলক করছে। পদাউকের সোনারঙ ফুল ফোটার এটিই সময়। মিয়ানমারে ওদের নাম সেন্না। মংডুর কিছু গাছ ব্রিটিশ আমলের। ওদের বয়স শতাব্দী বা তারও বেশি। বৃষ্টি শিরীষ, তেঁতুল এবং একটু কম বয়সী নারকেল গাছ। আছে কাঠগোলাপ ও সোনালু। নারকেল সর্বত্র। বাড়ির সামনের নারকেল গাছটির গোড়ার দিকে মাথা সমান উঁচুতে অর্কিড করেছে। তাতে রঙিন ও সাদা ফুল।

পাইক্যায় বোরকা পরা মহিলা। তার ওপর মাথায় ছাতা। ছবি তুলতে যেতেই ছাতা দিয়ে আড়াল তুলে দিল। হাঁটতে হাঁটতে শহরের পূর্ব দিকে শেউইজার সেতু পার হয়ে গেলাম। নদীর নাম সুধার ডিয়ার। এপারে মংডু, ওপারে সুধার পাড়া। মুসলিম গ্রাম।

সেতুর কাছেই পাঁচ-সাতজন মাছ নিয়ে বসেছে। তরিতরকারি নিয়ে বসেছে কয়েকজন। গ্রামের ছোট্ট বাজার। পাঁচ-ছয়টা বেড়ার দোকান। বুড়ো আঙুলের সমান চিংড়ির কিলো ৪ থেকে ৫ শ চ্যা। আমাদের তুলনায় পানির দাম। টাকার হিসাবে ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। নদীর উজান দিকে বিলে দেখা যাচ্ছে চিংড়ির ঘের। অঢেল মাছ পাওয়া যায় ওখানে। চায়ের দোকান থেকে লোকজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মংডুতে এখনো প্যান্ট দেখিনি। শুধু আমাদের পরনে প্যান্ট। মহাথেরো চীবর পরেছেন। বর্মীরা সবাই লুঙ্গি পরেছে। অফিস কাছারিতেও লুঙ্গি। গতকাল শুল্ক

অফিসের দুজনের প্যান্ট দেখেছি। ওরা পুলিশ। অন্যদের লুঙ্গি। লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোডা এই তিন নিয়ে মিয়ানমার। ফুঙ্গি হলো বৌদ্ধ ভিক্ষু। গম (ভালো), ছাম্মান বা সাম্পান, ছা (শাবক), থামি (বর্মী রমণীদের সেলাইবিহীন লুঙ্গি) ইত্যাদি অনেক শব্দ বার্মা ও আরাকান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাভাষায় ঢুকেছে।

বাসের চালে যাত্রীদের সঙ্গে ফুঙ্গি। পথে ঘাটে ফুঙ্গি। সকালে তারা খালি পায়ে ভিক্ষে করতে বের হন। ভিক্ষে ছাড়া ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের চলবে না। ভিক্ষাই তাদের জীবিকা। ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো। গায়ে আলাদা অন্য এক টুকরো চীবর থাকে। হাত কাটা ও এক কাঁধ কাটা একটা গেঞ্জি থাকে, কোমরে বেল্ট জাতীয় অর্থাৎ সেলাই করা কাপড়ের কোমর বন্ধনী থাকে। এসব মিলে ত্রিচীবর। আর হাতে থাকে ছাবাইক বা ভিক্ষাপাত্র। আদিতে এটি কাঠ বা লোহার হতো। এখন লাক্ষা দিয়ে তৈরি হয়। ভিক্ষুদের চীবর বিশেষ মাপে এবং অনেক জোড়া দিয়ে সেলাই করা হয়। এটি নিয়ম। সাধারণ লাল ও লালের কাছাকাছি রঙে চীবরে রঙ করা হয়। বার্মায় ফুঙ্গিদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়।

ছেলে-বুড়ো-যুবক-যুবতী সবার পরিধান লুঙ্গি। স্কুলের পোষাকও লুঙ্গি ও জামা বা শার্ট। বর্মি-মুসলমান-হিন্দু-বড়ুয়া-খ্রিস্টান সবার লুঙ্গি। বর্মিরা শার্টটি লুঙ্গির নিচে গুঁজে দেয়। মংডুর মুসলিমরা শার্ট পরে লুঙ্গির বাইরে। বার্মা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে লুঙ্গি প্রবেশ করে। মাত্র একশ বছরের মধ্যে সারা বাংলা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত লুঙ্গি চলে গেছে। লুঙ্গি, শার্ট ও বর্মি কোট, মাথায় বর্মি টুপি, পায়ে দুই ফিতের মজবুত স্যান্ডেল বর্মিদের জাতীয় পোশাক।

লোকজন আমাদের দেখছে। আমাদের পোশাক ও চাল-চলন ওদের থেকে ভিন্ন। সব দেশের লোক বিদেশিদের চিনতে পারে। সেতু পেরিয়ে ফিরে আসছি। কিছুদূর এসে মূল রাস্তা থেকে ডান দিকে বর্মি পাড়ায় ঢুকে পড়লাম। রাস্তার মোড়ে খালি জায়গায় বড় শিরীষ গাছের নিচে মিয়ানমারের তরুণী নুডলস বিক্রি করছে। ভাসমান দোকান। সকালের টিফিন এ রকম এক দোকানে পুলকসহ খেয়েছি। নুডলস, পোড়া লঙ্কাগুড়ো, তেঁতুলের টক, কলার থোড় ইত্যাদি সবজি দিয়ে স্যুপ, ডিমসেদ্ধ মিশিয়ে খেয়েছি। ডিমের খোসা ফেলে কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ক্ষিপ্র গতিতে। আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছে। সকালের জন্য আদর্শ খাবার বলা যায়। সঙ্গে বিনি পয়সায় দুধ চিনি ছাড়া চা দিয়েছে। দোকানি মাঝবয়সী মহিলা। ইঙ্গিতে, ইংরেজিতে কোনোমতে এক রকম করে কথা হলো। বুঝতে পারছি সারা ভ্রমণ এভাবে অপূর্ণ কথাবার্তা বলতে হবে।

দোকানটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মাথার উপর ছত্রাকার শিরীষ গাছের নিচে পলিথিন টাঙিয়ে দিয়েছে। লম্বা বেঞ্চিতে খাবারের বড় বড় ডেকচি। টুল আছে বসার। তরুণী বলল, বিকিকিনি শেষ। নুডলস আছে, কিন্তু মশলাপাতি ও তেঁতুলের ঝোল ফুরিয়ে গেছে। ওখান থেকে একটু এগিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকলাম। মালকিন বসে আছে চেয়ারে। রোয়াইংগা মুসলিম বয় আছে দুজন। ওরা মূলত চট্টগ্রামের। মালকিনকে বুঝিয়ে দিল আমাদের কথা। কিন্তু বিস্কুট বা সে রকম কোনো খাবার নেই। দুধ চিনির চা ও বিনি পয়সার চা আছে। দোকানের ভেতরে আরেক মহিলা চুরুট সিগারেট ও পান বেচতে বসেছে। অন্য মহিলারা আছে রান্নাঘরে। চা বানিয়ে দিচ্ছে। মহিলারা চিরস্বাধীন। দোকানের মালিক তারা। সবই খুব সাধারণ মানের। চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম।

শব্দার্থ ও টীকা

নিরবচ্ছিন্ন — একটানা। অবিরাম। নিরন্তর।
পাদরি — খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক।
অভিবাসন — স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস।
শুল্ক দফতর — পণ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানির ওপর কর ধার্য করে এমন অফিস।
দৌলত কাজী — সতের শতকের কবি। আরাকান রাজসভায় সাহিত্যচর্চা করেন।
আলাওল — সতের শতকের কবি। আরাকান রাজসভায় সাহিত্যচর্চা করেন। 'পদ্মাবতী' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।
শুক্লপক্ষ — অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলার বাড়ার সময়।
ক্যারিয়ার — গাড়ির পেছনে থাকা মালপত্র বা জন পরিবহণের জায়গা।
গ্লাভস — দস্তানা, হাতমোজা।
মালকিন — মহিলা মালিক। মালিকের স্ত্রী।
হামানদিস্তা — দ্রব্যসামগ্রী গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহৃত পাত্র ও দণ্ড।
মহাথেরো — বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান গুরু।
চ্যা — মিয়ানমারের টাকা।
চীবর — বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় গৈরিক পোশাকবিশেষ।
ফুঙ্গি — মায়ানমার অঞ্চলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিত।
প্যাগোডা — বৌদ্ধমন্দির।
লাক্ষা — গালা। লাল রঙের বৃক্ষনির্যাস।

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী একটি দেশের অর্থনীতি, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। ওই দেশ সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ ও ভালোবাসা সঞ্চারিত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

আমাদের পূর্ব দিকের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার। সেই দেশ ভ্রমণের ফলে লেখক যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার কিছু বিবরণ এই রচনায় পরিবেশিত হয়েছে। মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের শহর মংডু দিয়ে লেখকের ওই দেশ সফর শুরু হয়েছিল। মংডুর মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে একটি ধারণা এই রচনা থেকে পাওয়া যায়। মংডুতে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোক সম্পর্কেও পরিচয় আছে এতে। সেখানকার মেয়েরা অনেকটা স্বাধীনভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে অনেকে মংডুতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। আবার একই রাখাইন সম্প্রদায়ের লোক আছে মংডুতে ও বাংলাদেশের পটুয়াখালীতে। ফলে দুদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির মিলও লেখক খুঁজে পেয়েছেন। এক সময়ে মংডু ছিল আরাকান নামের এক স্বাধীন দেশের অংশ। আরাকানে ছিল মুসলমানদের শাসন। মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য থাকলেও মংডুতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানের বসবাস লক্ষ করেছেন লেখক।

লেখক-পরিচিতি

বিপ্রদাশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯৪০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের ইছামতী গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি শিশু একাডেমীতে কর্মরত ছিলেন। সহকারী পরিচালক হিসেবে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, লিখেছেন শিশুতোষ গল্প-উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ছোটগল্প : 'যুদ্ধজয়ের গল্প', 'গাঙচিল'; উপন্যাস : 'মুক্তিযোদ্ধারা', প্রবন্ধ : 'কবিতায় বাকপ্রতিমা'; নাটক : 'কুমড়োলতা ও পাখি'; জীবনী : 'বিদ্যাসাগর' (১৯৮৮), 'পল্লীকবি জসীমউদ্দীন'; শিশুতোষ গল্প : 'সূর্য লুঠের গান', শশুতোষ উপন্যাস : 'রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য'। তিনি দুবার অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার এবং বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'মংডুর পথে' ভ্রমণ কাহিনীটির কোন কোন বিষয় তোমাকে আনন্দ দান এবং অনুপ্রাণিত করেছে তার বিবরণ দাও।

খ. তোমার ব্যক্তিগত ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর (একক কাজ, ছবি ভৌগোলিক চিত্র ইত্যাদি সংযোজন করা যাবে)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মিয়ানমারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কী বলা হয় ?

ক. পুরোহিত　　খ. ফুঙ্গি

গ. ব্রাহ্মণ　　ঘ. মহাথেরো

২. ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর দেখতে কেমন ?

ক. কাঁধ কাটা গেঞ্জির মতো　　খ. সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো

গ. সেলাই করা লুঙ্গির মতো　　ঘ. কোমরের বেল্টের মতো

৩. সবদেশের লোক বিদেশিদের চিনতে পারে—

i. পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে

ii. চালচলন দেখে

iii. খাবার-দাবার দেখে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. i ও ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

ৃদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ান্নদাশঙ্কর রায় ফ্রান্সের প্যারিস নিয়ে লেখা 'পারী' প্রবন্ধে বলেছেন—'পারীর যারা আসল অধিবাসী, খুব খাটতে ারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করার সময়ও জামা সেলাই করে। জামা-কাপড়ের শখটা ফরাসিদের াসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ করে ফরাসি মেয়েদের ও শিশুদের'।

. উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' প্রবন্ধের মিয়ানমারবাসীর সংস্কৃতির যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো—

i. ভোজন বিলাসিতা

ii. ভূষণ বিলাসিতা

iii. শ্রমনিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

ৃজনশীল প্রশ্ন

. নারকেল শ্রীলংকানদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। নারকেলতেল ছাড়া তারা কোনো খাবার রান্না করে না। কারিতে নারকেলতেল ছাড়াও গুঁড়া শুঁটকি মাছ ব্যবহার করা হয়। এই গুঁড়া শুঁটকিকে তারা মসলার অংশ হিসেবে দেখে। এরা রান্নায় প্রচুর মসলা এবং লাল মরিচ ব্যবহার করে।

. শ্রীলংকার রাস্তায় যেসব তরুণীরা চলাচল করেন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। দামি পোশাক ও সাজগোজের দিকে তাদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। স্পষ্টতই মনে হয়, এরা জীবন-যাপনে সহজ-সুন্দর এবং এতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

ক. সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো বস্ত্রটির নাম কী ?

খ. 'বান্ডেল রোড তাদের স্মৃতি বহন করছে'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপক—১ এ 'মংডুর পথে' ভ্রমণ কাহিনীর যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপক-১ এবং উদ্দীপক-২ মিলে মিয়ানমারবাসীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পুরো দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে-'মংডুর পথে' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

বাংলা নববর্ষ

শামসুজ্জামান খান

বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন! শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই না, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহা—ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি। একে অন্যকে বলি, শুভ নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতি বছরই এ-উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে যে এতটা প্রাণের আবেগে এবং গভীর ভালোবাসায় এ উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তার কারণ পাকিস্তান আমলে পূর্ব-বাংলার বাঙালিকে এ-উৎসব পালন করতে দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। সে-বক্তব্য ছিল বাঙালির সংস্কৃতির ওপর এক চরম আঘাত। বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর এ আঘাত সহ্য করেনি। তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালির এ-উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সে-দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। ফলে পূর্ব-বাংলার বাঙালি ফুঁসে উঠেছে। সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে। এভাবেই পূর্ব-বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতিসত্তা গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বাংলা নববর্ষ এবং তার উদ্‌যাপনের আয়োজন।

১৯৫৪ সালের পূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে বিপুলভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হলে মুখ্যমন্ত্রী ও বাঙালিদের জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সরকার বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেটা ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন। কিন্তু সে-বিজয় স্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে এবং সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার। তবু পূর্ব-বাংলার বাঙালি পিছু হঠেনি। সরকারিভাবে আর নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়নি পাকিস্তান আমলে; কিন্তু বেসরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীরতর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এর

মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত উদ্‌যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট (১৯৬১)। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার পাকুড়মূলে ছায়ানট নববর্ষের যে-উৎসব শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন পরিবেশে এখন তা জনগণের বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় মুখোশ, কার্টুনসহ যে-সব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীকধর্মী চিত্র বহন করা হয় তাতে আবহমান বাঙালিত্বের পরিচয় এবং সমকালীন সমাজ-রাজনীতির সমালোচনাও থাকে।

এবার আমরা বাংলা সন ও নববর্ষ উদ্‌যাপনের কথা বলি। বাংলা সনের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতই মনে করেন মুগল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় সাধন করে ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সেজন্যই একে 'সন' বা 'সাল' বলে উল্লেখ করা হয়। 'সন' কথাটি আরবি, আর 'সাল' হলো ফারসি। এখনো সন বা সালই ব্যাপকভাবে চালু। তবে বঙ্গাব্দও বলেন কেউ কেউ।

বাংলা সন চালু হবার পর নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন, তাদের মিষ্টিমুখও করানো হতো। পান-সুপারিরও আয়োজন থাকত। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিলো খাজনা আদায়। মুরশিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন। বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান। জমিদারি উঠে যাওয়ায় এ অনুষ্ঠান এখন লুপ্ত হয়েছে।

পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল 'হালখাতা'। এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। তাই ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকসহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা দেখতে পেত না। ফলে সারাবছর বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে তাদের উপায় ছিল না। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা দোকানীদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন। অন্তত আংশিক পরিশোধ করেও নতুন বছরের খাতা খুলতেন। হালখাতা উপলক্ষে দোকানীরা ঝালর কাটা লাল নীল সবুজ বেগুনি কাগজ দিয়ে দোকান সাজাতেন। ধূপধুনা জ্বালানো হতো। মিষ্টিমুখ করানো হতো গ্রাহক-খরিদ্দারদের। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হতো। হালখাতাও এখন আর তেমন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় না। এখন মানুষের হাতে নগদ পয়সা আছে। বাকিতে বিকিকিনি এখন আর আগের মতো ব্যাপক আকারে হয় না।

বাংলা নববর্ষের আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে। এইসব মেলার অনেকগুলোই বেশ পুরনো। এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁ জেলার রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বৌদ্ধপূর্ণিমা মেলা। এক সময়ে এইসব মেলা খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। সে-মেলা এখনো বসে, তবে আগের সে জৌলুস এখন আর নেই। আগে গ্রাম-বাংলার এই বার্ষিক মেলাগুলোর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ তখনো সারাদেশে বিস্তৃত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল স্থবির। এখন যেমন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক দিনের বেশি লাগে না। আগে তা সম্ভব ছিল না। নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর, মোষের গাড়িতে মানুষ বা পণ্য পরিবহনে বহুসময় বা কয়েকদিন লেগে যেত। এখন নতুন নতুন পাকা রাস্তা ও দ্রুতগতির যানবাহন চালু হওয়ায় সে-সমস্যা আর নেই। আগে এইসব আঞ্চলিক মেলা থেকেই মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখত। তাছাড়া এইসব মেলা অঞ্চলবিশেষের মানুষের মিলন মেলায়ও পরিণত হতো। নানা সংবাদ আদান-প্রদান, নানা বিষয়ে মত বিনিময়েরও আদর্শ স্থান ছিল এই সব মেলা। আবার বাৎসরিক বিনোদনের জায়গাও ছিল মেলা। মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, নাগর দোলাসহ নানা আনন্দ-আয়োজন।

নববর্ষের ওই তিনটি প্রধান সর্বজনীন উৎসব ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উৎসব আছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত বলী খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ সাল থেকে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানাস্থানে এই খেলার প্রচলন আছে। এই বিখ্যাত কুস্তি খেলাকেই বলা হয় বলী খেলা। আবদুল জব্বার নামে এক ব্যক্তি এ খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে 'জব্বারের বলী খেলা' বলা হয়।

আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষদিনের সন্ধ্যারাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ব চাল ছেড়ে দিয়ে সারারাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে সেই ভেজা চাল সকলকে খেতে দিয়ে আমের ডালের কচি পাতা হাঁড়ির পানিতে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাদের বিশ্বাস, এতে বাড়ির সকলের কল্যাণ হবে। নতুন বছর হবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির। এ অনুষ্ঠান এখন খুব একটা দেখা যায় না।

নববর্ষের এ ধরনের আরও নানা অনুষ্ঠান আছে। তোমরা নিজ নিজ এলাকায় খোঁজ নিলে তার সন্ধান পাবে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে নানা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায়ও নববর্ষের উৎসব হয় নানা আনন্দময় ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে এরা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে 'বৈসাবী' নামে উৎসব করে। গ্রাম-বাংলায় নববর্ষে নানা খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো। মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে হতো গরুর দৌড়, হাডুডু খেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোরগের লড়াই, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, নড়াইলে ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি।

আধুনিককালের নব আঙ্গিকের বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা হয় কোলকাতার ঠাকুর পরিবারে এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে। সেই ধারা ধীরে ধীরে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের নববর্ষ উৎসব '৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করে। আগে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট-এর আয়োজনের কথা বলেছি। এছাড়া বাংলা একাডেমিতে বৈশাখী ও কারুপণ্য মেলা এবং গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা এলাকা পয়লা বৈশাখের দিনে লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা এবং নানা রঙের শাড়ি পরে মহিলা ও বালিকারা এই অনুষ্ঠানকে বর্ণিল করে তোলে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলের গান, লোকসংগীত এবং বাঁশির সুরে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই পরিবেশ আধুনিক বাঙালি জীবনের এক গৌরবময় বিষয়।

শব্দার্থ ও টীকা

পাকিস্তান আমল — ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সময়।

ছায়ানট — বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান।

মঙ্গল শোভাযাত্রা — মানুষের মঙ্গলকামনা করে যে মিছিল করা হয়।

আবহমান — যা আগে ছিল এবং এখনো আছে।

পুণ্যাহ — পুণ্যের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান।

হালখাতা — পহেলা বৈশাখে আয়োজিত অনুষ্ঠান-বিশেষ।

কবিগান — বাংলা গানের বিশেষ ধারা। দুজন গায়ক পালা করে একে অন্যের যুক্তি খণ্ডন করেন গানে গানে

কীর্তন — গুণ-বর্ণনা, সংকীর্তন, দেব-দেবীর মহিমা বা যশ প্রচারমূলক সংগীত।

যাত্রা — প্রাচীন বাংলার দৃশ্য কাব্য, মঞ্চে নাট্যাভিনয়।

বৈসাবী — বৈসুব, সাংগ্রাই, বিজু-এর প্রথম তিনটি বর্ণের সমাহার।

ঠাকুর পরিবার — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার।

বিশ্ববিদ্যালয় — এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝানো হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। এছাড়া তারা পাহাড়ীদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানবে। একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন কীভাবে বাঙালির রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে শিক্ষার্থীরা তাও অবগত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলা নববর্ষ বাঙালির খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আজকের বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতে পেরেছে, তার পেছনে নববর্ষের প্রেরণাও সক্রিয় ছিল। কারণ পাকিস্তানিরা বাঙালির প্রাণের উৎসব নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাধা দিয়েছিল এবং এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল তারা। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ইতিকথা মিশে আছে। আজও নববর্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। নববর্ষের উৎসব বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

বাংলা সন কে, কবে প্রচলন করেছিলেন এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও ধরে নেওয়া হয় সম্রাট আকবরের সময় এ সনের গণনা আরম্ভ হয়। পরে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড়, বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ এ উৎসবকে প্রাণে ধারণ করেছে। বাঙালি গৃহিণীরাও আমানিসহ নানা ব্রত-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে। পাহাড়ী অবাঙালির জনগোষ্ঠীও বৈসাবী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মতো করে তারা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে।

সূচনার পর থেকে এই নববর্ষ পালনে নানা মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। তবে এ উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করায় সে আয়োজন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে আমরাও নববর্ষ উৎসব ব্যাপকভাবে পালন আরম্ভ করি এবং এখন এই উৎসব বাঙালির জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

শামসুজ্জামান খান ১৯৪০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার চারিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাহমুদুর রহমান খান এবং মায়ের নাম শামসুন্নাহার খানম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৬৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালের মে মাসে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। শামসুজ্জামান খান লেখক, গবেষক ও ফোকলোরবিদ হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : প্রবন্ধগ্রন্থ 'নানা প্রসঙ্গ', 'গণসঙ্গীত', 'মাটি থেকে মহীরুহ', 'বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা', 'মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল', 'আধুনিক ফোকলোর চিন্তা', 'ফোকলোরচর্চা' ইত্যাদি। রম্য-রচনা : 'ঢাকাই রঙ্গরসিকতা', 'গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা' ইত্যাদি। শিশু সাহিত্য : 'দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ', 'লোভী ব্রাহ্মণ ও তেনালীরাম'। 'ছোটদের অভিধান' (যৌথ)।

শামসুজ্জামান খান তাঁর বিপুল কর্মজগতের স্বীকৃতিস্বরূপ অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, কালুশাহ পুরস্কার, দীনেশচন্দ্র সেন ফোকলোর পুরস্কার, আবদুর রব চৌধুরী স্মৃতি গবেষণা পুরস্কার, দেওয়ান মোর্তজা পুরস্কার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী জাতীয় গবেষণা পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় দাও (একক কাজ)।

খ. বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তুমি তোমার বিদ্যালয়ে কী ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করবে সে সম্পর্কে একটি রূপরেখা তৈরি কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা সন চালু করা হয় কোন সালে?

ক. ১৫৫৬ খ. ১৫৬১

গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৬৭

২. সাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. আরবি খ. বাংলা

গ. ফারসি ঘ. উর্দু

৩. বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত কারণ—

i. এ উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ

ii. এ সময় আমরা নতুন কাপড় পরে আনন্দ করি

iii. এটি প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

টুটুল টেলিভিশনে মধ্যযুগের নববর্ষের অনুষ্ঠানের কিছু অংশ দেখছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে ধনী গরিব সবাই জামা কাপড় পরে জমিদার বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছে। সেখানে তারা খাওয়া দাওয়া শেষে জমিদারকে খুশিমনে জমির খাজনা পরিশোধ করে ফিরে আসছে।

৪. টুটুলের দেখা অনুষ্ঠানটিকে কী বলা হয়?

ক. হালখাতা খ. পুণ্যাহ

গ. বৈসাবী ঘ. নবান্ন

৫. এ ধরনের অনুষ্ঠানের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনটি?

ক. অর্থনৈতিক খ. রাজনৈতিক

গ. সামাজিক ঘ. ধর্মীয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

সীমা ও চৈতি দুই বান্ধবী। আজ তাদের খুব আনন্দের দিন, কারণ আজ নববর্ষ। তারা দুজনে লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ে চলে যায় রমনার বটমূলে। সেখানে কত মানুষের ভিড়। ছেলে, মেয়ে, শিশু, বুড়ো, সবাই সেজেছে নতুন সাজে। সেখানে সীমার খালাতো বোন তন্বীর সাথে দেখা। সীমা খালা-খালু সবার খোঁজ পেল তন্বীর কাছ থেকে। ছোট খালাতো বোনের জন্য কিনে দিল নানান খেলনা; নিজের বাড়ির জন্য কিনে নিল কুলা, ঝুড়ি, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদি। চৈতি মনের আনন্দে গেয়ে উঠল :

তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

ক. বাংলা সন চালু করেন কে?

খ. হালখাতা বলতে কী বোঝায়?

গ. চৈতির গানে বাংলা নববর্ষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? — ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের মূল সুরটিই যেন ফুটে উঠেছে।— উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

বাংলা ভাষার জন্মকথা

হুমায়ুন আজাদ

কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা ? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো ? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা ? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার আগেও এদেশে ভাষা ছিল। সে ভাষায় এদেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

আজ থেকে এক শ বছর আগেও কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানত না কত বয়স এ ভাষার। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এক দল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথামতো চলেনি। না চলে চলে অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে, বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটেনি বাংলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল সমাজের উঁচুশ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। তা কথ্য ছিল না। কথা বলত মানুষেরা নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায়। প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাংলা ভাষার।

কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছিল বাংলার ? এ

সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা। পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা দেয় বাংলা ভাষার ইতিহাস। যে ইতিহাস বলার জন্য আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।

ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে, শব্দে লক্ষ করা যায় গভীর মিল। এ ভাষাগুলো যে সব অঞ্চলে ছিল ও এখন আছে, তার সবচেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ আর সবচেয়ে পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ ভাষাগুলোকে একটি ভাষাবংশের সদস্য বলে মনে করেন। ওই ভাষাবংশটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেকগুলো ভাষা-শাখা, যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোতে। এগুলো সম্ভবত লিখিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বেদের শ্লোকগুলো পবিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা সেগুলো মুখস্ত করে রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে থাকে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করত বদলে যেতে থাকে সে ভাষা। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদরা নানা নিয়ম বিধিবন্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষার নাম 'সংস্কৃত', অর্থাৎ বিধিবন্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই এ ভাষা বিধিবন্ধ হয়েছিল।

যিশুর জন্মের আগেই পাওয়া যায় ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির নাম বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ এ ভাষার কাল। তারপর পাওয়া যায় সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে এটি সম্ভবত বিধিবন্ধ হতে থাকে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতেই এটি চূড়ান্তভাবে বিধিবন্ধ হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকে। এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে নানান আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা- বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলা; আর আসামি ও ওড়িয়া ভাষা। তাই বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আর কয়েকটি ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাংলার সঙ্গে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মৈথিলি, মগধি, ভোজপুরিয়া। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একটি প্রাকৃতের নাম বলেন গৌড়ী প্রাকৃত। তিনি মনে করেন, গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার।

শব্দার্থ ও টীকা

তরু	–	বৃক্ষ, গাছ।
ভাষাতাত্ত্বিক	–	ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেন।
শতাব্দী	–	একশ বছর।
শ্লোক	–	সংস্কৃত ভাষায় রচিত দুই চরণে অন্ত্যমিলযুক্ত এবং প্রায়শই চার লাইনে বিভক্ত কবিতা বা কবিতাংশ।
দুর্বোধ্য	–	যা বোঝা কঠিন, সহজে বোঝা যায় না এমন।
বিধিবন্ধ	–	নিয়ম দ্বারা শাসিত, নিয়মের অধীন।
ঘনিষ্ঠ	–	নিকট, নিবিড়, খুব কাছের।
উদ্ভূত	–	উৎপন্ন, জাত।
উৎপত্তি	–	সূচনা, শুরু, জন্ম।
উদ্ভব	–	সূচনা, জন্ম, অভ্যুদয়, উৎপত্তি।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী বাংলা ভাষার জন্মকথা জানতে পারবে। বাংলা ভাষা যে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তার মমত্ববোধ জাগবে।

পাঠ-পরিচিতি

'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সে সঙ্গে শব্দের অর্থেরও। এক সময় ধারণা করা হতো বাংলা এসেছে সংস্কৃত থেকে। তখনকার দিনে সংস্কৃত ছিল উঁচুশ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। সাধারণ মানুষ কথা বলত প্রাকৃত ভাষায় আর এ প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি শাখা হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা।

এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর বিকৃত রূপ হচ্ছে অপভ্রংশ। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, পূর্ব-মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌড়ী প্রাকৃতের পরিবর্তিত রূপ গৌড়ী অপভ্রংশ। গৌড়ী অপভ্রংশ থেকেই জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষা।

লেখক-পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার রাড়িখাল গ্রামে। একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গবেষক হিসেবে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে 'শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা', 'বাক্যতত্ত্ব' ইত্যাদি। কিশোর পাঠকদের জন্য লেখা দুটি গ্রন্থ 'লালনীল দীপাবলি', 'কতো নদী সরোবর'। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অলৌকিক ইস্টিমার' ও 'জ্বলো চিতাবাঘ' উল্লেখযোগ্য। তিনি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ সালের ১২ই আগস্ট জার্মানির মিউনিখ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. বাংলা ভাষার জন্মকথা নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে হুমায়ুন আজাদ রচিত 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়।)

খ. তোমার এলাকার আঞ্চলিক শব্দগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট জমা দাও (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অনেকেই কোন ভাষাকে বাংলার জননী মনে করত ?

ক. হিন্দি খ. গুজরাটি

গ. সংস্কৃত ঘ. মারাঠি

২. কোনটি উঁচু শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা ছিল ?

ক. বাংলা খ. সংস্কৃত

গ. প্রাকৃত ঘ. মৈথিলি

৩. প্রাকৃত ভাষা বলতে বোঝায়—

ক. গণমানুষ সচরাচর যে ভাষায় কথা বলে

খ. শিক্ষিত জনগণ যে ভাষায় কথা বলে

গ. অঞ্চল বিশেষের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে

ঘ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যে ভাষায় কথা বলে

৪. উল্লিখিত বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরটির নাম কী?

ক. সংস্কৃত খ. প্রাকৃত

গ. বৈদিক ঘ. আর্য

৫. উক্ত স্তরটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো—

i. এটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত

ii. এই স্তরের বিবর্তিত রূপই ভারতবর্ষের নতুন ভাষা

iii. এই স্তরটি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়

নিচের কোনটি সঠিক উত্তর?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

পারমিতা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। একদিন বাংলা ব্যাকরণে ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় দুটো বৈশিষ্ট্যের দিকে ওর নজর আটকে গেল। বৈশিষ্ট্য দুটি হলো—(ক) ভাষা যত কঠিন শব্দ দিয়েই শুরু হোক না কেন, ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের ফলে তা সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। যেমন-চক্র > চক্ক > চাকা, চর্মকার > চম্মআর > চামার, হস্ত > হত্থ > হাত ইত্যাদি। এবং একসময় এরকম সরলীকরণ হতে হতে একটি নতুন ভাষারই উদ্ভব হয়। (খ) কালের পরিক্রমায় একটি ভাষা স্থানিক ও কালিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বহুরূপী হয়ে ওঠে। যেমন—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে। পারমিতা ভাবতে থাকে।

ক. 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ কী ?

খ. একদল লোক বাংলাকে 'সংস্কৃতের মেয়ে' মনে করত কেন ?

গ. অনুচ্ছেদের ক. নং বৈশিষ্ট্যটির মধ্য দিয়ে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

ঘ. পারমিতার পঠিত খ. নং বৈশিষ্ট্যটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

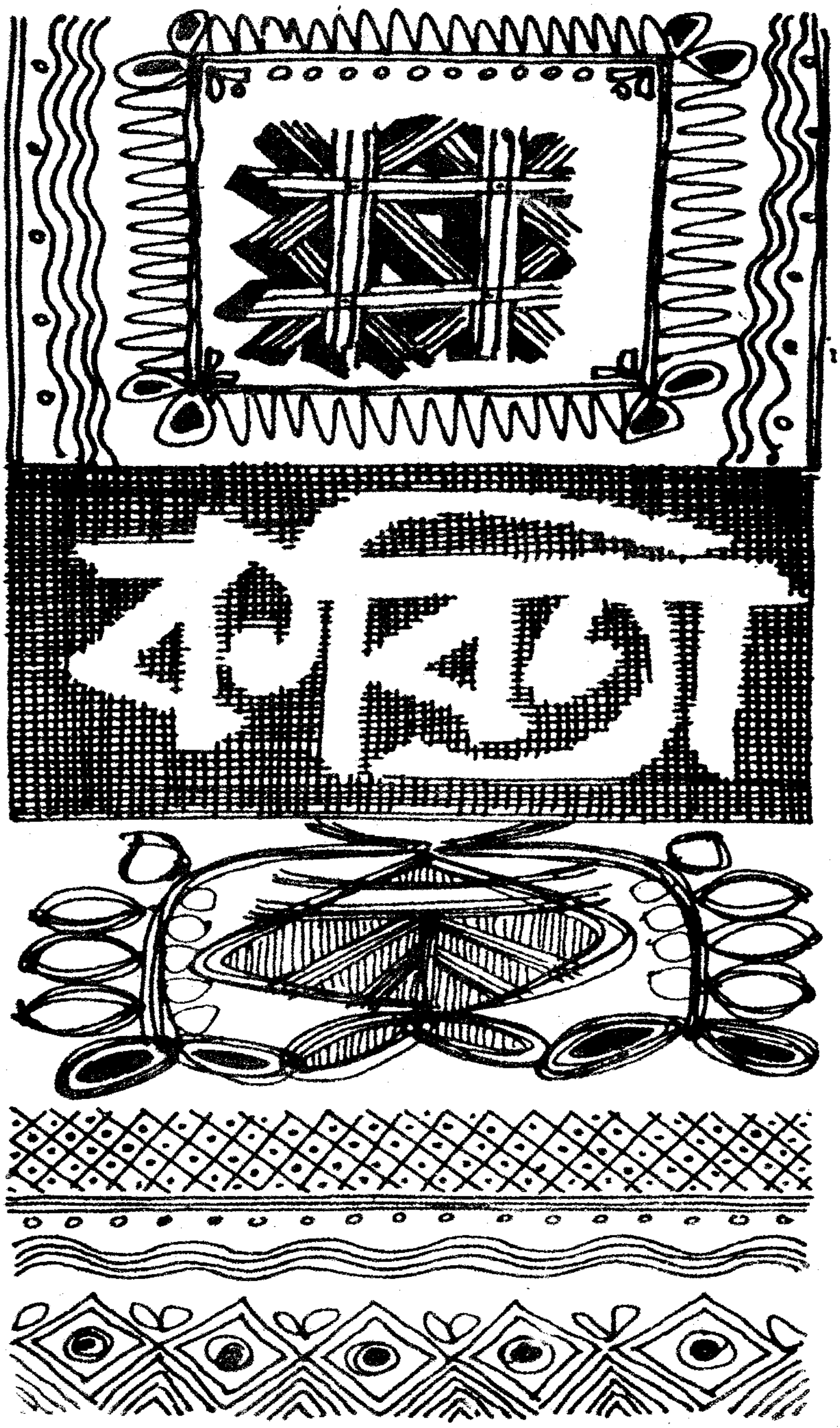
কবিতা

মানবধর্ম

লালন শাহ্

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥

কেউ মালা, কেউ তস্‌বি গলায়,
তাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ॥

গর্তে গেলে কূপজল কয়,
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়,
মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে ॥

জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা-তথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে ॥

শব্দার্থ ও টীকা

কয়	— বলে।
জেতের	— জাতের। এখানে জাতি বা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে।
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়	— জন্ম বা মৃত্যুর সময়।
কূপজল	— কুয়োর পানি।
গঙ্গাজল	— গঙ্গা নদীর পানি। এখানে পবিত্র অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গঙ্গার জল হিন্দুদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক।
জেতের ফাতা	– জাত বা ধর্মের বৈশিষ্ট্য অর্থে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। তারা জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' গানটি 'মানবধর্ম' কবিতা হিসেবে এ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। এ কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। নিজে কোনো ধর্মের বা জাতের এমন প্রশ্ন লালন সম্পর্কে আগেও ছিল, এখনো আছে। লালন বলেছেন, জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্যধর্মই মূলকথা। জন্ম-মৃত্যু কালে কি কোনো মানুষ তসবি বা জপমালা ধারণ করে থাকে? সে-সময় তো সবাই সমান। মানুষ জাত ও ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে লালন তা বিশ্বাস করেন না।

কবি-পরিচিতি

লালন শাহ্ মানবতাবাদী মরমি কবি। সাধক সিরাজ সাঁই বা সিরাজ শাহ্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তিনি লালন সাঁই বা লালন শাহ্ নামে পরিচিতি অর্জন করেন। গানে তিনি নিজেকে ফকির লালন হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের চিন্তা ও সাধনায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এই জ্ঞানের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মিলনে তিনি নতুন এক দর্শন প্রচার করেন। গানের মধ্য দিয়ে তাঁর এই দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাত্মভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা তাঁর গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি সহস্রাধিক গান রচনা করেন।

লালন শাহ্ ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঝিনাইদহ, মতান্তরে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার চারদিকে নানা শ্রেণিপেশা ও ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষ রয়েছে। এদের সম্পর্কে তোমার সহপাঠীদের মনোভাব জেনে একটি গবেষণা নিবন্ধ তৈরি কর। শিক্ষকদের সহযোগিতায় প্রশ্নমালা তৈরি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করতে হবে। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণি,পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষই যে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য—এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি করতে হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের কোন পরিচয়টি বড় হওয়া উচিত?

ক. সামাজিক পরিচয় খ. ধর্মীয় পরিচয়
গ. মানুষ পরিচয় ঘ. পেশার পরিচয়

২. লালনের মতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর–

i. জাতের বড়াই
ii. কূপের জল
iii. বংশ কৌলিন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

৩. লালন শাহ্ রচিত গানটি 'মানবধর্ম' শিরোনামে গৃহীত হয়েছে। শিরোনামটির মর্মার্থ নিচের কোন পঙ্ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. এসো আজ মুঠি মুঠি মাখি সে আলো!

খ. শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

গ. কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা।

ঘ. পথশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।

৪. উক্ত মর্মার্থে মূলত প্রকাশ পেয়েছে লালন শাহ'র–

i. ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস
ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনা
iii. মানবতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে
বামুন, শূদ্র বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।

ক. 'কূপজল' অর্থ কী?

খ. জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় কেন? —ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের যে মিল পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।

ঘ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় যে ধর্মচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো, মা, দাসেরে মনে,   এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো   তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,   নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর,   হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো   পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা   সেবে সর্বজন;
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি,   কহ, গো, শ্যামা জন্ম দে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ, ধর
অমর করিয়া বর   দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস   কী বসন্ত, কী শরদে!

শব্দার্থ ও টীকা

মিনতি	— বিনীত প্রার্থনা।
পরমাদ	— প্রমাদ; ভুল-ভ্রান্তি।
কোকনদ	— লাল পদ্ম।
নীর	— পানি; জল।
শমন	— মৃত্যুর দেবতা।
মক্ষিকা	— মাছি।
শ্যামা জন্ম দে	— শ্যামল জন্মভূমি অর্থে।
বর	— আশীর্বাদ।
মানস	— মন।
তামরস	— পদ্ম।
শরদে	— শরৎ কাল বোঝাতে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি শিক্ষার্থীর মনে শ্রদ্ধা ও বিনয়ভাব জেগে উঠবে। বিদেশের ঐশ্বর্য ও জৌলুস সত্ত্বেও নিজ দেশের প্রতি মনের গভীরে আগ্রহবোধ সৃষ্টি হবে।

পাঠ-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কয়েকটি গীতিকবিতার একটি 'বঙ্গভূমির প্রতি'। এ কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশকে কবি মা হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে ভেবেছেন তার সন্তান। প্রবাসী মধুসূদন ভেবেছেন—মা যেমন সন্তানের কোনো দোষ মনে রাখেন না, দেশমাতৃকাও তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্য তিনি বিনয়ের সঙ্গে এও বলেছেন যে, তাঁর এমন কোনো মহৎ গুণ নেই, যে-কারণে তিনি স্মরণীয় হতে পারেন। বিনয়ী কবি তাই দেশমাতৃকার কাছে এই বলে প্রণতি জানাচ্ছেন, তিনি যেন দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকেন।

কবি-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রথাবিরোধী লেখক। তিনি মহাকাব্য, গীতিকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য, নাটক, প্রহসন ইত্যাদি রচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শৈশব থেকে তাঁর মনে কবি হওয়ার তীব্র বাসনা ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, বিলেত না গেলে কবি হওয়া যাবে না। বিলেতে গেলে সুবিধা হবে—এ আশায় তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। পরে তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং বাংলায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও তিনি হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রহসন : 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'; নাটক : 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী'; পত্রকাব্য : 'বীরাঙ্গনা' ইত্যাদি। 'চতুর্দশপদী কবিতা' নামে বাংলা সনেটের রচয়িতাও তিনি। এই মহান সাহিত্যস্রষ্টা ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে। শুদ্ধ উচ্চারণ, উচ্চারণে স্পষ্টতা, শ্রবণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মক্ষিকা'র সমার্থক শব্দ কোনটি?

ক. মৌমাছি খ. মাছি
গ. বোলতা ঘ. ফড়িং

২. নরকুলে ধন্য কে?

ক. ক্ষমতাবান ব্যক্তি খ. দীর্ঘজীবী মানুষ
গ. যিনি কীর্তিমান ঘ. মন্দিরের সেবক

নিচের কবিতাংশ পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি।

খ. রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।

৩. কবিতাংশ দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে—

i. দৃঢ় বিশ্বাস
ii. সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত
iii. গভীর আকুলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কবিতাংশ দুটিতে সম্বোধিত 'মা' কে?

ক. কবির মা খ. জননী জন্মভূমি
গ. কোনো এক মা ঘ. সকল মা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;

২. রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে

ক. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী?
খ. কবি বর প্রার্থনা করেন কেন? —ব্যাখ্যা কর।
গ. কবিতাংশ দুটিতে কী অমিল লক্ষ করা যায়?—আলোচনা কর।
ঘ. কবিতাংশ দুটির মূল সুর একই—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।
কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।
শুনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে। কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রুর হাসি হেসে, আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোল—
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো।
নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল—নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।
ধিক ধিক ওরে, শত ধিক তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কী জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা!
আজ কোন রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন—

তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন।
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন!
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি!
যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী।
বিদীর্ণহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, এ কি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন—
ভাবিলাম হায় আর কী কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা,
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।
হেনকালে হায় যমদূত প্রায় কোথা হতে এল মালি,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতে ছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, মারিয়া করিব খুন।
বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!
বাবু কহে হেসে বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।
আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

শব্দার্থ ও টীকা

বিঘে	— বিঘা শব্দের চলিত রূপ। জমির পরিমাপ বিশেষ। কুড়ি কাঠা বা ১৪৪০০ বর্গফুট বা ১৩৩৪ বর্গমিটার পরিমাণ জমি।
ভূস্বামী	— অনেক জমির মালিক। জমিদার।
দিঘে	— দৈর্ঘ্যে। লম্বা দিকের মাপে।
পাণি	— হাত।
বক্ষে জুড়িয়া পাণি	— বুকে জোড় হাত রেখে অনুনয় করে।
সপ্ত পুরুষ	— পূর্ববর্তী সাত বংশধর বা প্রজন্ম।
লক্ষ্মীছাড়া	— লক্ষ্মী ছেড়েছে এমন। দুর্ভাগা। ভাগ্যহীন।
ক্রুর	— নিষ্ঠুর। নির্দয়।
ডিক্রি	— আদালতের হুকুম বা নির্দেশনামা।
খত	— ঋণপত্র। ঋণের দলিল।
ভূরি ভূরি	— প্রচুর।
কাঙাল	— নিঃস্ব। দরিদ্র।
মোহগর্ত	— মোহের ক্ষুদ্র গহ্বর।
বিশ্বনিখিল	— গোটা দুনিয়া। সমগ্র পৃথিবী।
হেরিলাম	— দেখলাম।
ধাম	— তীর্থস্থান।
ভূধর	— পর্বত। পাহাড়।
নমঃ নমঃ নমঃ	— নমস্কার। বন্দনাজ্ঞাপক অভিব্যক্তি বিশেষ।
সমীর	— বাতাস। বায়ু।
ললাট	— কপাল।
খেলাগেহ	— খেলাঘর।
নিশীথ	— গভীর রাত।
নিশীথ শীতল স্নেহ	— হৃদয়জুড়ানো গভীর মমতা।
প্রহর	— তিন ঘণ্টা কাল। দিনরাত্রির আট ভাগের এক ভাগ।
গোলা	— শস্য রাখার মরাই বা আড়ত।
তৃষাতুর	— পিপাসা বা তৃষ্ণায় কাতর।
পঁহুছিনু	— পৌঁছে গেলাম।
লভিল	— লাভ করল। পেল।
উড়ে	— ভারতের উড়িষ্যা বা ওড়িয়া প্রদেশের লোক।
কলবর	— কোলাহল। হট্টগোল। হৈচৈ।
পারিষদ	— মোসাহেব। পার্শ্বচর।
ঘটে	— মাথার মগজে। এখানে ভাগ্যে অর্থে ব্যবহৃত।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা শোষকশ্রেণির নিষ্ঠুর শোষণ ও গরিবদের দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারবে। গরিবদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'দুই বিঘা জমি' একটি কাহিনী-কবিতা। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত : দরিদ্র কৃষক উপেন অভাব-অনটনে বন্ধক দিয়ে তাঁর প্রায় সব জমি হারিয়েছে। বাকি ছিল মাত্র দুই বিঘা জমি। কিন্তু জমিদার তাঁর বাগান বাড়ানোর জন্য সে জমির দখল নিতে চায়। কিন্তু সাত পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত সে জমি উপেন দিতে না চাইলে জমিদারের ক্রোধের শিকার হয় সে। মিথ্যে মামলা দিয়ে জমিদার সে জমি দখল করে নেয়। ভিটেছাড়া হয়ে উপেন বাধ্য হয় পথে বেরুতে। সাধু হয়ে সে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোরে। কিন্তু পৈতৃক ভিটের স্মৃতি সে ভুলতে পারে না।

একদিন চির-পরিচিত গ্রামে সে ফিরে আসে। গ্রামের অন্য সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও তার ভিটে আজ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু হঠাৎ সে লক্ষ করে তার ছোট বেলার স্মৃতি-বিজড়িত সেই আম গাছটি এখনও আছে। সেই আম গাছের ছায়াতলে বসে ক্লান্ত-শ্রান্ত উপেন পরম শান্তি অনুভব করে। তার মনে পড়ে, ঝড়ের দিনে কত না আম সে কুড়িয়েছে এখানে। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় দুটি পাকা আম পড়ে তার কোলের কাছে। আম দুটিকে সে জননীর স্নেহের দান মনে করে গ্রহণ করে। কিন্তু তখনই ছুটে আসে মালি। সাধু উপেনকে সে আম-চোর বলে গালাগালি করতে থাকে। উপেনকে জমিদারের নিকট হাজির করা হয়। উপেন জমিদারের কাছে আমটি ভিক্ষা হিসেবে চাইলে জমিদার তাকে সাধুবেশী চোর বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

এই কবিতার মাধ্যমে কবি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজে এক শ্রেণির লুটেরা বিত্তবান প্রবল প্রতাপ নিয়ে বাস করে। তারা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে সম্পদশালী হয়। তারা অর্থ, শক্তি ও দাপটের জোরে অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিতে কবি এদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

কবি-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, বিশ্বনন্দিত কবি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশোনায় তাঁর মন বসে নি। পড়াশোনার জন্য তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি—এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ শেষ করার আগেই তিনি সেসব ছেড়ে দেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। সাহিত্যের সকল শাখায় অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। কবিতা, সংগীত, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ, উজ্জ্বল। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, গীতিকার, সুরকার, শিক্ষাবিদ, চিত্রশিল্পী, নাট্য-প্রযোজক ও অভিনেতা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের জাতীয় সংগীত আমার 'সোনার বাংলা' তাঁরই লেখা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. কবিতাটি তোমার নিজস্ব ভাষায় গল্পে, নাটিকায় বা বর্ণনাধর্মী গদ্যে রূপায়িত কর।
খ. তোমার জানা কোনো কৃষকের অত্যাচারিত জীবনের একটি কাহিনি লিপিবদ্ধ কর (একক কাজ)।
গ. কবিতাটির নাট্যরূপ দাও এবং শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'দুই বিঘা জমি' কোন ধরনের কবিতা ?

ক. কাহিনি-কবিতা খ. গীতিকবিতা

গ. চতুর্দশপদী কবিতা ঘ. স্বদেশপ্রেমের কবিতা

২. 'সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম'—পঙ্‌ক্তিটিতে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. স্মৃতিকাতরতা

ii. স্পর্শকাতরতা

iii. অনুদারতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৩. বাবু সাহেবের সম্পত্তি-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে যে চরণে—

i. বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে

ii. পেলে দুই বিঘে, প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা

iii. এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এক যুগ আগে আমেরিকায় গিয়ে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন শামিম সাহেব। কিন্তু তারপরও তার মনে সুখ নেই। সেখানকার পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষজন কোনোকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে না। সারাক্ষণ মনটা পড়ে থাকে আঁকা-বাঁকা মেঠো পথের ধারের কুঁড়েঘরে, যেখানে কেটেছে তার শৈশব, কৈশোরের সোনালি সময়।

৪. উদ্দীপকে শামিম সাহেবের মানসিকতায় 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ?

ক. স্বদেশপ্রীতি খ. প্রকৃতিপ্রীতি

গ. স্বাজাত্যপ্রীতি ঘ. মর্ত্যপ্রীতি

৫. উক্ত অনুভূতি ফুটে উঠেছে নিচের কোন চরণে ?

ক. চেয়ে দেখো মোর আছে বড়-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।

খ. কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।

গ. কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি ক্ষুধাহরা সুধারাশি।

ঘ. তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে, সেই দুই বিঘা জমি।

সৃজনশীল প্রশ্ন

গাজীপুর চৌরাস্তার কাছে মতিন মিয়ার ছোট্ট এক চায়ের দোকান। আর দোকানের পাশেই গড়ে উঠেছে 'ক' হাউজিং সোসাইটির বিশালাকার অ্যাপার্টমেন্ট। একদিন সকালে মতিন দেখে, তার দোকান অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আটকে গেছে। সে বুঝে গেল আর কিছুই করার নেই। উপায়ান্তর না দেখে সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ফ্লাক্সে করে চা বিক্রি করে সংসার চালায় আর উদাস দৃষ্টিতে গগনচুম্বি অট্টালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান?

খ. 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. 'ক' হাউজিং সোসাইটির কার্যক্রমে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার বাবু সাহেব চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের মতিন 'দুই বিঘা জমির' শোষিত উপেনের সার্থক প্রতিনিধি কি না—এবিষয়ে তোমার মতামত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কর।

পাছে লোকে কিছু বলে

কামিনী রায়

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

হৃদয়ে বুদবুদ মতো,
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি
নিরমল নয়নের জলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা
চলে যাই উপেক্ষার ছলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
এক সাথে মিলে সবে
পারি না মিলিতে সেই দলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

বিধাতা দিছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মাণ
শক্তি মরে ভীতির কবলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

শব্দার্থ ও টীকা

সদা	— সবসময়।
সংশয়	— সন্দেহ। দ্বিধা।
সংকল্প	— মনের দৃঢ় ইচ্ছা।
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে	— মনের দৃঢ় ইচ্ছা পূরণ করায় বাধা তৈরি হয়।
শুভ্র	— সাদা। এখানে পরিষ্কার বা অমলিন অর্থে ব্যবহৃত।
যবে	— যখন।
প্রশমিতে	— উপশম ঘটাতে, নিবারণ করতে।
প্রশমিতে পারে ব্যথা	— যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে।
উপেক্ষা	— গ্রাহ্য না করা। অবহেলা করা। গুরুত্ব না দেয়া।
ছল	— ছুতা, ওজর।
ম্রিয়মাণ	— কাতর। বিষাদগ্রস্ত।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচ চিত্তে জীবনপথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কে কী বলল তা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতা থেকে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।

পাঠ-পরিচিতি

কোনো কাজ করতে গেলে কেউ কেউ অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কে কী মনে করবে, কে কী সমালোচনা করবে এই ভেবে তারা বসে থাকে। এর ফলে কাজ এগোয় না। যাঁরা সমাজে অবদান রাখতে চান তাঁদের দ্বিধা করলে চলবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে হবে। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়-ভীতি সংকোচ উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে।

কবি-পরিচিতি

১৮৬৪ সালের অক্টোবর মাসে বরিশালের বাসন্ডা গ্রামে কামিনী রায়ের জন্ম। ১৮৮৬ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পাস করে তিনি ওই কলেজেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। কামিনী রায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। আনন্দ বেদনার সহজ-সরল প্রকাশে তাঁর কবিতা তাৎপর্য অর্জন করেছে। তাঁর লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম 'গুঞ্জন'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'পাছে লোকে কিছু বলে' শীর্ষক কবিতার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তোমার কিংবা তোমার পরিচিত লোকজনের সমস্যা নিয়ে গল্প, নাটিকা বা প্রবন্ধ রচনা কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহৎ কাজ সম্পাদনে কোনটিকে উপেক্ষা করতে হবে ?

ক. সংকোচ খ. সংশয়

গ. সংকল্প ঘ. বাধা

২. আর্তের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও কেউ কেউ কেন উপেক্ষা করে চলে যান ?

ক. রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে খ. সমালোচনার ভয়ে

গ. সহযোগিতার ভয়ে ঘ. ছোট হওয়ার ভয়ে

৩. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি পাঠকের মধ্যে কোন ধরনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে ?

ক. ভয়হীনতা খ. পরোপকারিতা

গ. সাহসিকতা ঘ. সংকোচহীনতা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাসুদ গ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। সে ভাবে এক সময় প্রচুর আয় হবে, বেকাররা স্বনির্ভর হবে। কিন্তু যদি সে এ কাজে সফল হতে না পারে তাহলে তার সমালোচনা করবে। তাই সে তার পরিকল্পনা বাদ দেয়।

৪. উদ্দীপকের মাসুদের মাঝে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে ?

ক. ভীরুতা খ. সংশয়

গ. হতাশা ঘ. দুর্বলতা

৫. কামিনী রায়ের দৃষ্টিতেই মাসুদের এ উদ্যোগ সফল করা যেতে পারে—

i. দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলে

ii. সকল সংশয় দূর করলে

iii. সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের কবিতাংশ পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো
যুগ-জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে
নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে, পবিত্রতা আনে
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মতো কে জানে ?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর ?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।

ক. 'সদা' শব্দটির অর্থ কী ?

খ. সংশয়ে সংকল্প সদা টলে—কেন ?

গ. উদ্দীপকের নিন্দুক ও 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় নিন্দুকের বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের নিন্দুকের প্রভাব আর 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় বর্ণিত নিন্দুকের প্রভাবকে একসূত্রে গাঁথা যায় কী ? যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ।

২. গ্রীষ্মের ছুটি হলে শফিক বাড়িতে আসে। কয়েকজন বেকার যুবক ও সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে পরিকল্পনা করে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় খোলার। সবাই তার এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। এজন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র, ঘর, শিক্ষক সবই নির্বাচন করে। এমন সময় গ্রামের এক লোক বলে, এর আগে কামাল মাস্টারের মতো মানুষ এ কাজে ফেল মেরেছে, সেখানে কচি শিশুরা খুলবে নৈশ বিদ্যালয়? একথা শুনে তারা দমে যায়।

ক. সংকল্প শব্দটির অর্থ কী ?

খ. একটি স্নেহের কথায় কীভাবে আমাদের ব্যথা দূর হতে পারে ?

গ. শফিকের উদ্যোগ ব্যাহত হওয়ার কারণ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শফিকের মাঝে কী ধরনের পরিবর্তন এলে সে তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হতো তা 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার আলোকে যুক্তিসহ লেখ।

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

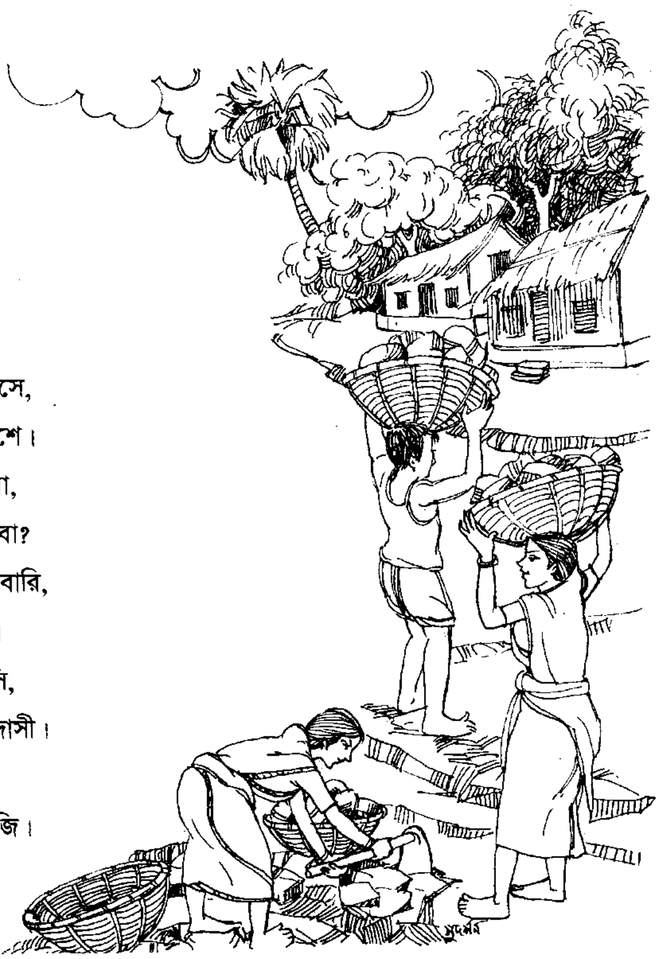

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।
সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারী বন্দী, তবে এর পরযুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য	— সমতা। সকলের জন্যে সম অধিকার।
মহীয়ান	— সুমহান। এখানে মহিমান্বিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
রণ	— যুদ্ধ। লড়াই।
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর	— অসংখ্য নারী স্বামীকে হারিয়েছে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি	— হৃদয়ভরা মমতা দিয়ে উৎসাহিত করল নারী।
বিজয়-লক্ষ্মী নারী	— জয়ের নিয়ন্তা দেবী হিসেবে নারীকে কল্পনা করা হয়েছে।
ডঙ্কা	— জয়ঢাক।
রচা	— রচনা করা হয়েছে এমন। সৃষ্টি করা হয়েছে এমন।
পীড়ন	— অত্যাচার। নির্যাতন। শারীরিক কষ্ট প্রদান।
পীড়া	— যন্ত্রণা। কষ্ট। বেদনা।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। মানবসভ্যতায় নারীর অবদান যে পুরুষের চেয়ে কম নয় তা জেনে নারীর অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'নারী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। সাম্যবাদী কবি 'নর-নারী' উভয়কেই মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি জগতে নর ও নারীর সাম্য বা সমান অধিকারে আস্থাবান। তাঁর মতে, পৃথিবীতে মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের অবদান সমান। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয়েছে নারীর অবদান ততটা লেখা হয় নি। কিন্তু এখন দিন এসেছে সম অধিকারের। তাই নারীর ওপর নির্যাতন চলবে না, তাঁর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা চলবে না। নারী-পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে হবে সম্মিলিতভাবে।

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করতে পারেন নি। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর রচনাবলি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উত্তম দৃষ্টান্ত।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প—সাহিত্যের সকল শাখায় আমরা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে থাকি। বাংলায় তিনি ইসলামি গান ও গজল লিখে প্রশংসা পেয়েছেন। লেখায় তিনি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। কবি ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম–অনুশীলন

ক. তোমার পরিচিতজনদের মধ্যে এমন কোনো নারীর জীবনালেখ্য রচনা কর যার কর্মজগৎ নিয়ে তুমি গর্ব করতে পার (একক কাজ)।

খ. নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য তোমার সহপাঠীদের মধ্যে একটি গবেষণা চালাতে পার। এর জন্য শিক্ষকের সহযোগিতায় প্রথমেই প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে। যেমন— ১.সংসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে? উত্তর হতে পারে নারী, পুরুষ, অথবা উভয়ই।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মৃত্যুবরণ করেন ?

ক. ১৯১৯ খ. ১৯৭২
গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৬

২. বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে কোনটি লেখা নেই ?

ক. বোনের সেবা খ. নারীর সিঁথির সিঁদুর
গ. ভগ্নির আত্মত্যাগ ঘ. বধূদের আত্মত্যাগ

৩. 'পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই'—চরণটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রবাদবাক্য—

i. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়
ii. যেমন কর্ম তেমন ফল
iii. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গণসংগীত শিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া জীবিকার তাগিদে কোদাল-টুকরি নিয়ে পুরুষ শ্রমিকদের সাথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি কাটেন। দিন শেষে মজুরি নিতে গিয়ে দেখেন পুরুষ শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে দু-শ টাকা আর তাকে দেওয়া হলো একশ টাকা। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে মালিক বলে—এটাই নিয়ম!

৪. বিজ্ঞাপিত উদ্দীপকটির সাথে 'নারী' কবিতার ভাবগত ঐক্যের দিকটি হলো—

i. বৈষম্য

ii. শোষণ

iii. সাম্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. উদ্দীপকের ভাব নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে ?

ক. অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর

খ. কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে

গ. বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি

ঘ. কোন কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আনোয়ারা নামটি এখন টক অব দ্যা কান্ট্রি। একজন নারী হয়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজ করেছেন। সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ তিনি কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেছেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে তিনি অন্য পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে যথাযথ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন। নারী বলে কোথাও তাকে সমস্যায় পড়তে হয় নি।

ক. 'নারী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?

খ. কবি বর্তমান সময়কে 'বেদনার যুগ' বলতে কী বুঝিয়েছেন ?

গ. আনোয়ারার কার্যক্রমে 'নারী' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুভূতির প্রতিফলন ঘটলেও 'নারী' কবিতায় কবি আরও বেশি বাঙ্ময়—বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২. জনৈক সমালোচকের মতে—ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গীয় মুসলমান নারীসমাজ ছিল অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ। নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদ-বুদ্ধিও ছিল তাদের জন্য নিয়তির মতো সত্য। অবরুদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এক অসহায় জীবে তারা পরিণত হয়েছিলেন। এদেরকে আলোর জগতে আনার জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর বক্তব্য—'আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীভাবে ? কোন এক পা বাধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে একই।'

ক. কাজী নজরুল ইসলামকে কত সালে এ দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় ?

খ. 'সাম্যের গান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?

গ. জনৈক সমালোচকের মতটি 'নারী' কবিতার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বেগম রোকেয়ার বক্তব্য যেন কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতারই প্রতিধ্বনি—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়; রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

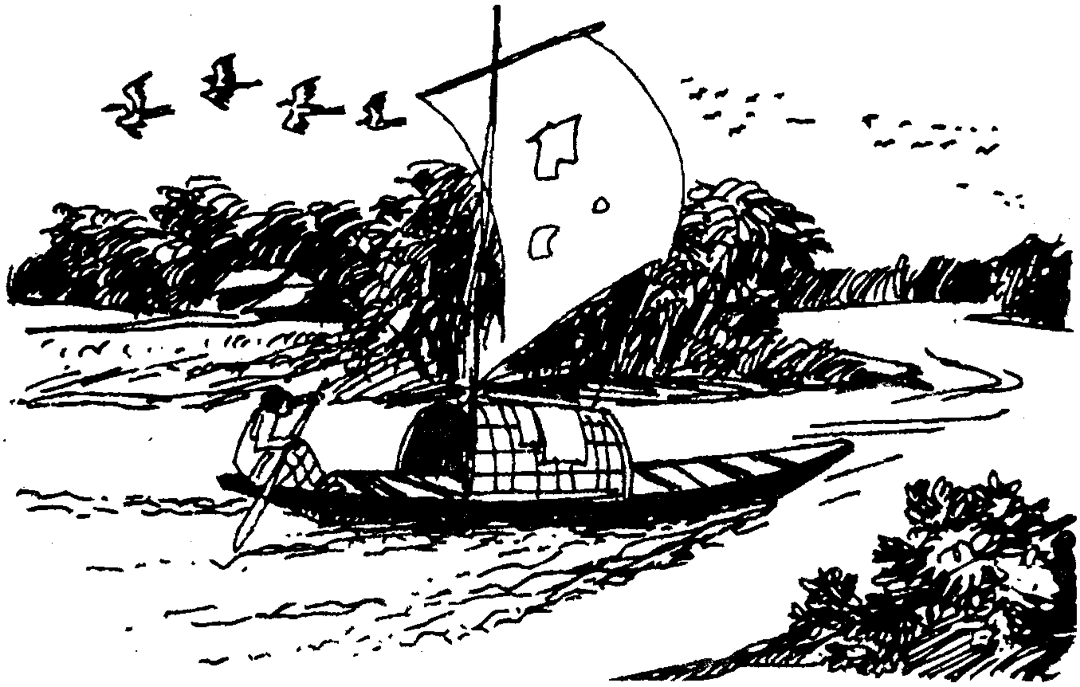

শব্দার্থ ও টীকা

শঙ্খচিল	— এক ধরনের সাদা চিল।
ঘুঙুর	— নূপুর, পায়ের অলংকার।
ডাঙা	— শুকনো জায়গা, স্থলভূমি।
সুদর্শন	— এক ধরনের গুবরে পোকা।
লক্ষ্মীপেঁচা	— সুলক্ষণযুক্ত পেঁচা।
ডিঙা	— ছোট নৌকা।
নীড়ে	— পাখির বাসায়।
ধবল	— সাদা।
নবান্ন	— নতুন ধানকাটার পর আমাদের দেশে এ উৎসব হয়। এ উৎসবে দুধ, গুড়, নারকেলের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন আতপ চালের ভাত খাওয়া হয়।
ধানসিঁড়ি	— ঝালকাঠি জেলায় ধানসিঁড়ি নামে একটি নদী ছিল। এখন নদীটি মরে গেছে। কবি তাঁর কবিতায় এ নদীটির নাম ব্যবহার করেছেন।
রূপসা	— খুলনা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর নাম। এ নামে ঝালকাঠি জেলায়ও একটি ছোট নদী আছে।
জলাঙ্গী	— কবি এখানে নদীকে জলাঙ্গী (অর্থাৎ জল যার অঙ্গে) নামে অভিহিত করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে কবি জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা বলেছেন।
কার্তিকের নবান্নের দেশে	— কবি নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশকে নবান্নের দেশ বলেছেন। নবান্ন অর্থ নতুন ভাত। কার্তিক মাসে ঘরে নতুন ধান তুলে কৃষকেরা নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধের জাগরণ ঘটবে।

পাঠ-পরিচিতি

'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে। কবি এ কবিতায় দেখিয়েছেন যে, তিনি নিজের দেশকে খুবই ভালোবাসেন। প্রিয় জন্মভূমির অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসগুলো তাঁর দৃষ্টিতে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। কবি মনে করেন, যখন তাঁর মৃত্যু হবে তখন দেশের সঙ্গে তাঁর মমতার বাঁধন শেষ হবে না। তিনি বাংলার নদী, মাঠ, ফসলের খেতকে ভালোবেসে শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে এদেশে ফিরে আসবেন। আবার কখনও বা ভোরের কাক হয়ে কুয়াশায় মিশে যাবেন। এমনও হতে পারে, তিনি হাঁস হয়ে সারাদিন কলমির গন্ধে ভরা বিলের পানিতে ভেসে বেড়াবেন। এমনকি দিনের শেষে যে সাদা বকের দল মেঘের কোল ঘেঁষে নীড়ে ফিরে আসে তাদের মাঝেও কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবেন।

কবি-পরিচিতি

কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতা সিটি কলেজ, দিল্লি রামযশ কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, খড়গপুর কলেজ, বরিষা কলেজ ও হাওড়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। এক সময় তিনি সাংবাদিকতার পেশাও অবলম্বন করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির রং ও রূপের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। অনেক অজানা গাছ, পশু-পাখি ও লতাপাতা তাঁর কবিতায় নতুন পরিচয়ে ধরা পড়েছে। প্রকৃতিপ্রেমিক এই কবি প্রকৃতি থেকেই তাঁর কবিতার রূপরস সংগ্রহ করেছেন। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় নিহত হন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. কবিতাটির দৃশ্যচিত্র অবলম্বনে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণে)।

খ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি অবলম্বনে একক ও দলগত আবৃত্তির আয়োজন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ধানসিঁড়ি কিসের নাম ?

ক. নদীর   খ. শহরের
গ. ধানের   ঘ. গ্রামের

২. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ?

ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি   খ. রূপসী বাংলা
গ. ঝরাপালক   ঘ. বনলতা সেন

৩. 'সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে'—এখানে সারাদিন কেটে যাবে কার ?

ক. হাঁসের   খ. কিশোরীর
গ. কাকের   ঘ. কবির

কবিতাংশটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'গোধূলি লগনে জগদীশে স্মরণে
বিদায় লইব জনমের তরে
লুকাইব আমি সন্ধ্যার আঁধারে বাংলা মায়ের ক্রোড়ে'॥

৪. উদ্দীপকে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে ?

ক. স্বদেশচেতনা   খ. মৃত্যুচেতনা
গ. প্রকৃতিচেতনা   ঘ. ধর্মচেতনা

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ফুটে উঠেছে নিচের কোন চরণে ?

i. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়
ii. হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে
iii. আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পল্লির সন্তান অমিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ফ্রান্স যায়। সেখানকার সুপ্রস্ত রাজপথ, উদ্যান, নির্মল প্রকৃতি তার খুব ভালো লাগে। রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, বাস-স্টপেজ সব জায়গায় দেশি-বিদেশি স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে ফরাসিদের দেশপ্রেম দেখে সে বিস্মিত হয়। ওদের ক্যাফে, মিউজিয়াম সবকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে অমিত স্থায়ীভাবে সেখানে থেকে যায়। ফরাসি সৌন্দর্যের মোহে ক্রমশ ধূসর হয়ে যায় তার অতীতস্মৃতি।

ক. উঠানে খইয়ের ধান ছড়ায় কে ?
খ. মানুষ না হয়ে শঙ্খচিল, শালিকের বেশে জীবনানন্দ দাশ এদেশে ফিরতে চান কেন ?
গ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় উদ্দীপকের ফরাসি জাতির কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে ? বর্ণনা কর।
ঘ. অমিতের অনুভূতি আর জীবননান্দ দাশের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীতল
এত সুখ শান্তি এত পরিমল
কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া।

ক. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কোন কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে ?
খ. 'বাংলার সবুজ করুণ ডাঙা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?
গ. উদ্দীপক অবলম্বনে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।
ঘ. 'কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া'—কথাটির সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের বাংলায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে সম্পর্কিত—আলোচনা কর।

দেশ

জসীমউদ্‌দীন

খেতের পরে খেত চলেছে, খেতের নাহি শেষ
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলো মাথার কেশ।
সেই কেশেতে গয়না পরায় প্রজাপতির ঝাঁক,
চঞ্চুতে জল ছিটায় সেথা কালো কালো কাক।
সাদা সাদা বক-কনেরা রচে সেথায় মালা,
শরৎকালের শিশির সেথা জ্বালায় মানিক আলা।
তারি মায়ায় থোকা থোকা দোলে ধানের ছড়া;
মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন পরির দেশ?
নিবিড় ছায়ায় আঁধার করা পাতার পারাবার
রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।
সুবাস ফুলের বুনোট করা বনের লিপিখানি,
ডালের থেকে ডালের পরে ফিরছে পাখি টানি।
কচি কচি বনের পাতা কাঁপছে তারি সুরে
ছোট ছোট রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে।
মাথার পরে কালো কালো মেঘরা এসে ভেড়ে
বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।

নদীর পরে নদী গেছে নদীর নাহি শেষ,
কত অজান গাঁ পেরিয়ে কত না-জান দেশ।
সাত সাগরের পণ্য চলে সওদাগরের নায়
সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ-নগর ছায়।
চখায় মুখর বালুর চরা হাসে কতই তীরে
ফুলের বনে রঙিন হয়ে যায় বা কভু ধীরে
কত মিনার-সৌধ চূড়ার কোল ঘেঁষিয়ে যায়
কত শহর হাট-বন্দর-বাজার ফেলে বায়।
কত নায়ের ভাটিয়ালির গানে উদাস হয়ে
নদীর পরে নদী চলে কোন অজানায় বয়ে।

শব্দার্থ ও টীকা

সবুজ হাওয়া	— সবুজ খেতের ওপর বয়ে যাওয়া বাতাসকে কবি সবুজ হাওয়া রূপে কল্পনা করেছেন।
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলো মাথার কেশ	— শস্যের দোলায়মান সবুজ ডগাকে মাথার এলো চুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
সেই কেশেতে গয়না পরায় প্রজাপতির ঝাঁক	— শস্যের দোলায়মান ডগার ওপর ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ছে, বসছে। দূর থেকে মনে হয় শস্যের ডগা যেন অলংকার পরে সেজেছে।
চঞ্চু	— ঠোঁট।
আলা	— আলো। কবিতার মিলের জন্য কবি আলোকে আলা হিসেবে প্রয়োগ করেছেন।
শরৎকালের শিশির সেথা জ্বালায় মানিক আলা	— ঘাসের ওপর শরতের শিশির জমে। সকালে তার ওপর রোদ পড়লে তা জ্বলজ্বল করে ওঠে–যেন মনির আলো।
মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা	— মায়ের আঁচল সন্তানের স্নেহের আশ্রয়। তেমনি সোনার ফসল পেলে মানুষের অভাব ঘোচে।
সুবাস ফুলের বুনোট করা বনের লিপিখানি	— সুগন্ধি ফুলে ফুলে ভরে ওঠে বন।
বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে	— কালো মেঘ থেকে বৃষ্টি নামছে। কবি কল্পনা করছেন যেন বুনো হাতি পানি ছিটাচ্ছে
নায়	— নৌকায়
সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ-নগর ছায়	— সওদাগররা শহরে-গঞ্জে নানা সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে মানুষের সুখী জীবনযাপনে সহায়তা করে।
চখা	— চক্রবাক পাখি।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হবে। তাদের মনে দেশের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'দেশ' কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের 'মাটির কান্না' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানুষের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতির একদিকে রয়েছে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের খেত, অন্যদিকে সেখানে পাখ-পাখালির আনাগোনা, শরতের শোভা, ফসলের হাতছানি।

গ্রামের আর একদিকে রয়েছে বন-বনানী। ফুলে ও ফলের সম্ভারে ও নানা বনজ সম্পদে ভরপুর সে-সব। গ্রাম বাংলায় বয়ে গেছে কত-না নদী। সেই নদীতে নৌকা ভাসায় মাঝি। সওদাগরের দল শহরে-গঞ্জে সওদা পৌঁছে দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার নানা অভাব মেটায়।

কবি-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে, মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি পাঁচ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগ দেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'কবর' কবিতাটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁর কবিতায় আমরা পল্লির মানুষ ও প্রকৃতির সহজ-সুন্দর রূপটি দেখতে পাই। পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিহৃদয় যেন এক হয়ে মিশে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গাথাকাব্য : 'নকসীকাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'; কাব্যগ্রন্থ : 'রাখালী', 'বালুচর', 'মাটির কান্না'; নাটক : 'বেদের মেয়ে'; উপন্যাস : 'বোবা কাহিনী'; গানের সংকলন : 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'হাসু', 'এক পয়সার বাঁশী', 'ডালিমকুমার'। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. সংবাদ পাঠ, অনুষ্ঠান উপস্থাপন ও আবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

খ. তোমার দেশ ও দেশের প্রকৃতি নিয়ে ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শনের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'দেশ' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ?

ক. নকসীকাঁথার মাঠ　　খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. মাটির কান্না　　ঘ. রাখালী

২. 'শরৎ কালের শিশির সেথা জ্বালায় মানিক আলা।'— এ কথার তাৎপর্য :

i. শিশির রোদের দ্যুতি বিচ্ছুরণ
ii. শিশিরের টলটলায়মান অবস্থা
iii. শারদীয় প্রকৃতির উজ্জ্বল রূপ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩. কবি মাতৃস্নেহের সমতুল্য বিবেচনা করেছেন কোনটিকে ?

ক. ধানের ছড়া　　খ. ফুলের সুবাস
গ. পাতার পারাবার　　ঘ. রোদের গুঁড়া

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমার বাড়ির গাঁয়ের পথে সবুজ মাঠের ধারে
অদূর বনের হাতছানি ভাই মন যে সদাই কাড়ে।
সকাল সাঁঝে আপন কাজে রাখাল গেয়ে যায়
হাওয়ায় দুলি ধানের শিষে ডাক দে বলে আয়।

৪. উদ্দীপকটি 'দেশ' কবিতার সঙ্গে কোন বিষয়গত দিক থেকে সংগতি রচনা করে ?

i. প্রকৃতি
ii. মানুষ
iii. ফসল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii   খ. i ও iii
গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

৫. উল্লিখিত সংগতির অন্তর্নিহিত ঐক্যের দিকটি হলো–

ক. দেশপ্রেম   খ. প্রকৃতিপ্রেম
গ. স্বাজাত্যবোধ   ঘ. মানবপ্রেম

সৃজনশীল প্রশ্ন

ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা রূপের সুধায়
হৃদয় আমার যায় জুড়িয়ে ও আমার বাংলা মাগো।
ফাগুনে তোর কৃষ্ণচূড়া পলাশ বনে কীসের হাসি
চৈতী রাতে উদাস সুরে রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশী।

ক. চঞ্চু শব্দটির অর্থ কী ?
খ. 'মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব হরা'–কথাটির অর্থ বুঝিয়ে বল।
গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণে 'দেশ' কবিতার যে অনুভূতির ছায়াপাত আছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপক আর 'দেশ' কবিতাটি যেন একই সুরে বাঁধা–বিশ্লেষণ কর।

নদীর স্বপ্ন

বুদ্ধদেব বসু

কোথায় চলেছো ? এদিকে এসো না!
দুটো কথা শোনো দিকি,
এই নাও—এই চকচকে, ছোটো,
নতুন রুপোর সিকি।
ছোকানুর কাছে দুটো আনি আছে,
তোমায় দিচ্ছি তাও,
আমাদের যদি তোমার সঙ্গে
নৌকায় তুলে নাও।
নৌকা তোমার ঘাটে বাঁধা আছে—
যাবে কি অনেক দূরে?
পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো
মোরে আর ছোকানুরে।
আমারে চেনো না? আমি যে কানাই।
ছোকানু আমার বোন।
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা
মেঘনা, পদ্মা, শোণ।
শোনো, মা এখন ঘুমিয়ে আছেন,
দিদি গেছে ইশকুলে,
এই ফাঁকে মোরে—আর ছোকানুরে—
নৌকোয় নাও তুলে।
কোনো ভয় নেই—বাবার বকুনি
তোমায় হবে না খেতে,
যত দোষ সব আমরা—না, আমি
একা নেবো মাথা পেতে।

অনেক রঙের পাল আছে, মাঝি?
বেগুনি, বাদামি, লাল?
হলদেও?—তবে সেটা দাও আজ,
বেগুনিটা দিয়ো কাল।
সবগুলো নদী দেখাবে কিন্তু!—
আগে পদ্মায় চলো,
দুপুরের রোদে ঝলমল জল
বয়ে যায় ছলোছলো।
শুয়ে-শুয়ে দেখি অবাক আকাশ,
আকাশ ম—স্ত বড়ো,
পৃথিবীর সব নীল রং বুঝি
সেখানে করেছে জড়ো।
ঝাঁকে ঝাঁকে বেঁকে ঐ দ্যাখো পাখি
উড়ে চলে যায় দূরে
উঁচু থেকে ওরা দেখতে কি পায়
মোরে আর ছোকানুরে?
ওটা কী? জেলের নৌকা?— তাই তো!
জাল টেনে তোলা দায়,

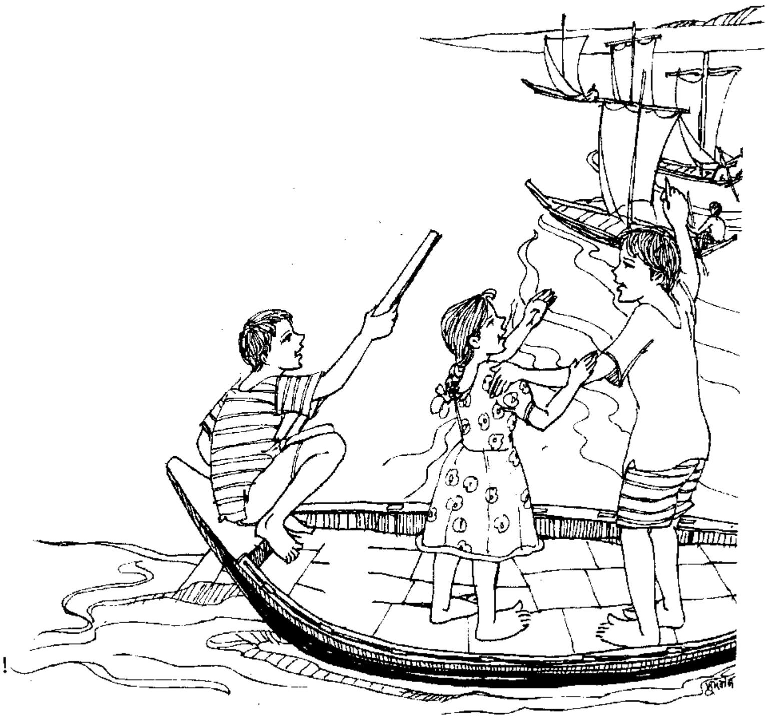

রুপোলি নদীর রুপোলি ইলিশ—
[illegible]
ইলিশ কিনেছো— [illegible]
তুমি খুব ভালো, মাঝি।
উনুন ধরাও, ছোকানু দেখাক
রান্নার কারসাজি।
পইঠায় বসে ধোঁয়া-ওঠা ভাত,
টাটকা ইলিশ-ভাজা—
ছোকানু রে, তুই আকাশের রানি,
আমি পদ্মার রাজা।

খাওয়া হলো শেষ, আবার দেখছি
দুলছে ছোট্ট নাও,
হালকা নরম হাওয়ায় তোমার
লাল পাল তুলে দাও।
দেখি বসে বসে আকাশের রং
কী আশ্চর্য নীল
ছোটো পাখি আরও ছোটো হয়ে যায়
আকাশের মুখে তিল।
সারাদিন গেলো, সূর্য লুকোলো
জলের তলার ঘরে,
সোনা হয়ে জ্বলে পদ্মার জল
কালো হলো তার পরে।
সন্ধ্যার বুকে [illegible]—
এবার নামাও পাল,
গান ধরো, মাঝি; জলের শব্দ
ঝুপঝুপ দেবে তাল।
ছোকানুর চোখ ঘুমে ঢুলে আসে
আমি ঠিক জেগে আছি,
গান গাওয়া হলে আমায় অনেক
গল্প বলবে, মাঝি?
শুনতে শুনতে আমিও ঘুমোই
বিছানা বালিশ বিনা—
মাঝি, তুমি দেখো ছোকানুরে, ভাই,
ও বড়োই ভীতু কিনা।
আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না
আমি তো বড়োই প্রায়
ঝড় এলে ডেকো আমারে—ছোকানু
যেন সুখে ঘুম যায়।
সব নাও, মাঝি, চকচকে সিকি
এই আনি দুটো, তাও।
লক্ষ্মী তো, মোরে—আর ছোকানুরে
নৌকায় তুলে নাও।

শব্দার্থ ও টীকা

সিকি	— চার আনি মূল্যের মুদ্রা বা ২৫ পয়সার মুদ্রা।
আনি	— এক টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যের মুদ্রা।
শোন	— একটি নদীর নাম।
পাল	— বাতাসের সাহায্যে চালাবার জন্য নৌকায় খাটানো কাপড়ের পর্দা।
কারসাজি	— কূটকৌশল। এখানে চমৎকারিত্ব অর্থে কাব্যিক ব্যবহার।
সূর্য লুকালো	— সূর্য অস্ত গেল।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠ করার কারণে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটবে। প্রকৃতি ও দেশের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। ভাইবোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

পাঠ-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসুর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদী এবং নৌভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের কল্পনা রূপায়িত হয়েছে। দুরন্ত এক কিশোর তার ছোট বোনকে নিয়ে নৌকাতে উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। নৌকার নানা রঙের পাল, নীল রঙের আকাশ, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির উড়ে চলা, রুপালি ইলিশ মাছ, নৌকায় রান্না করা, সন্ধ্যায় গান গাওয়া, গল্পকরা—এত কিছু কিশোর মনে গভীর স্বপ্ন নিয়ে আসে। পাশাপাশি এ কবিতায় বোনের প্রতি ভাইয়ের দায়িত্ব ও আদর প্রকাশের চমৎকার নিদর্শন আছে ।

কবি-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনি, স্মৃতিকথা, অনুবাদ, সম্পাদনা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক (সম্মান) এবং পরের বছর প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রথমে সাংবাদিকতা এবং পরে অধ্যাপনাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে তাঁর ও অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'প্রগতি' (১৯২৭-১৯২৯) প্রকাশিত হয়। তিনি 'কবিতা পত্রিকা' নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যরীতির বাইরে পৃথক কাব্যধারার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসুর রচনাশৈলী স্বতন্ত্র ও মনোজ্ঞ। তিনি বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর অর্থাৎ বর্তমানের মুন্সিগঞ্জে। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার ভালো লাগার স্বপ্ন নিয়ে কবিতা, গল্প বা নাটিকা তৈরি কর (একক কাজ)।

খ. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটির একটি গদ্যরূপ উপস্থাপন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রথম দিন নৌকায় কোন রঙের পাল খাটানোর কথা বলা হয়েছিল?
ক. বেগুনি খ. বাদামি
গ. লাল ঘ. হলুদ

২. কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!
দুটো কথা শোনো দিকি,
চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে—
ক. আদেশ খ. নির্দেশ
গ. অনুরোধ ঘ. অনুনয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কিশোর মোরা ঊষার আলো, আমরা হাওয়া দুরন্ত,
মনটি চির বাঁধন হারা, পাখির মতো উড়ন্ত।

৩. উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণের অর্থের সাথে মিল পাওয়া যায় নিচের কোন চরণের অর্থের?
ক. পায়ে পড়ি, মাঝি সাথে নিয়ে চলো, মোরে আর ছোকানুরে
খ. ছোকানুরে, তুই আকাশের রানি, আমি পদ্মার রাজা
গ. লক্ষ্মী তো, মোরে—আর ছোকানুরে, নৌকায় তুলে নাও
ঘ. এই ফাঁকে মোরে—আর ছোকানুরে, নৌকায় তুলে নাও

৪. উক্ত পঙ্ক্তি দুটিতে যে আবেগ ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে—
i. কিশোর মনের উচ্ছ্বাস
ii. ভাই ও বোনের সত্যিকার মর্যাদা
iii. কল্পনার অবাধ প্রবাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

৫. নুরু, শফি, আয়েশা, রেহানা বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে পরির দিঘির পাড়ে মিলিত হয়েছে। বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে চাল, ডাল, ডিম, মসলা—সবকিছু। জমিয়ে পিকনিক হবে। রান্নার ধুম লেগেছে। রান্না শেষ হতেই নুরুর দেখাদেখি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল দিঘির জলে। দাপাদাপি যেন শেষ হতেই চায় না। শেষে রেহানার চেঁচামেচিতে সবাই এসে কলাপাতায় পাত পেড়ে খেতে বসল। খাবার মুখে দিয়েই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নুন—নুন দেয়া হয় নি যে। আবার এক দফা হেসে নিয়ে সবাই গপাগপ খিচুড়ি খেতে বসে গেল। খুউব ক্ষুধা পেয়েছে যে!

ক. দুপুরের রোদে জল কেমন করে বয়ে চলে?
খ. নৌকা-ভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে আনি বা পয়সা দিতে চেয়েছিল কেন?—ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের সাথে কবিতার কী অমিল লক্ষ করা যায়—আলোচনা কর।
ঘ. বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন—বিশ্লেষণ কর।

জাগো তবে অরণ্য কন্যারা

সুফিয়া কামাল

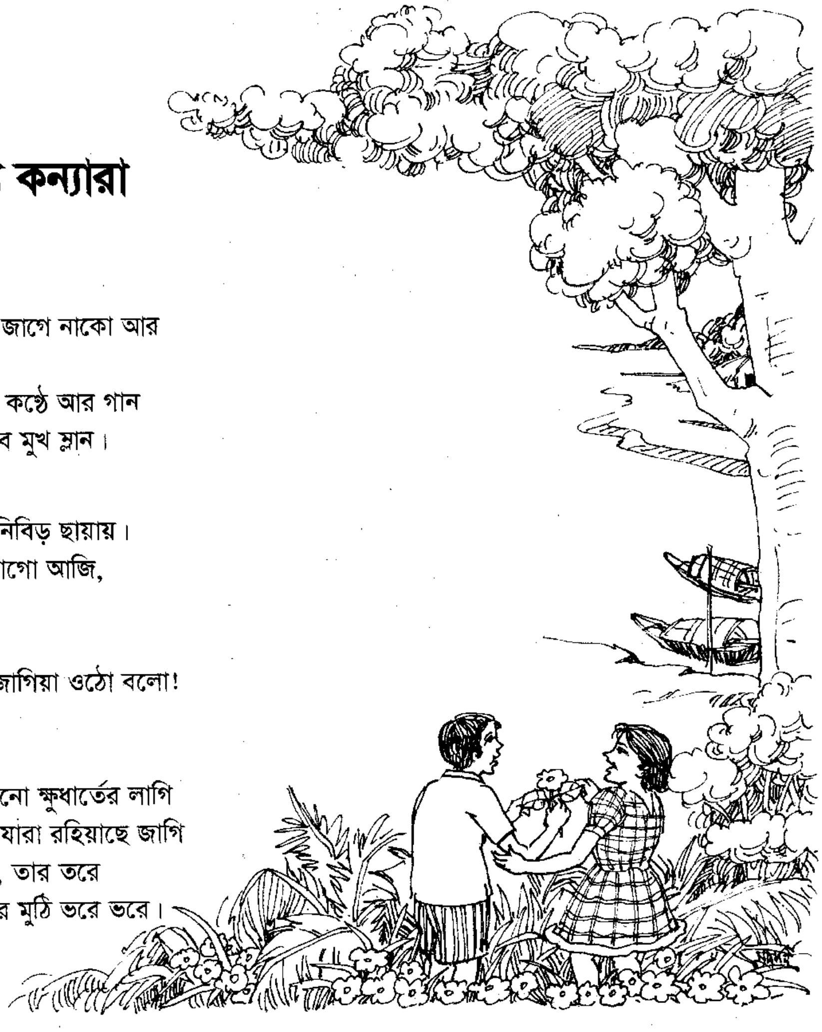

মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর
চারিদিকে শুনি হাহাকার।
ফুলের ফসল নেই, নেই কারও কণ্ঠে আর গান
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।

মাটি অরণ্যের পানে চায়
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা! জাগো আজি,
মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা
মেলি লেলিহান শিখা তোমরা জাগিয়া ওঠো বলো!
কঙ্কণে তুলিয়া ছন্দ তান
জাগাও মুমূর্ষু ধরা-প্রাণ
ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো ক্ষুধার্তের লাগি
আত্মার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি
তিমির প্রহর ভরি অতন্দ্র নয়ন, তার তরে
ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।

শব্দার্থ ও টীকা

ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি	— প্রকৃতিতে ফুল ও ফসলের সম্ভার কমে যাওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় মানুষ ভীত।
ম্লান	— মলিন।
ক্ষরিছে	— চুয়ে চুয়ে পড়ছে।
পল্লব	— গাছের নতুন পাতা। ডালের নতুন পাতাযুক্ত আগা।
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়	— মাটির মমতা রস পেয়ে বৃক্ষশাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা	— কবি বৃক্ষ-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছেন প্রকৃতিকে আবার শ্যামল সবুজে ফলে-ফুলে ভরিয়ে তোলার জন্যে।
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা	— মানুষ প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করায় বন উজাড় হচ্ছে। বৃক্ষনিধন বাড়ছে। বৃক্ষের বুকে তাই যন্ত্রণার আগুন।
মেলি লেলিহান শিখা	— কবি তরুকন্যাকে আহ্বান জানাচ্ছেন তার শাখায় শাখায় আগুন রঙা ফুল ফুটিয়ে আকাশে শাখা বিস্তার করতে।
কঙ্কণ	— কাঁকন, নারীর হাতের অলঙ্কার বিশেষ।
মুমূর্ষু	— মৃতপ্রায়। মরণাপন্ন। মরে যাচ্ছে এমন।
ধরা-প্রাণ	— পৃথিবীর জীবন।
অতন্দ্র	— তন্দ্রাহীন। ঘুমহীন। নির্ঘুম। নিদ্রাহীন।
নয়ন	— চোখ।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতিজগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে আগ্রহী হবে এবং প্রকৃতির ঐশ্বর্য রক্ষায় সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি সুফিয়া কামালের 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। প্রকৃতির রূপ-সচেতন কবি চারপাশের অরণ্য-নিধন লক্ষ করে ব্যথিত। তাই মৌসুমি ফুলের গান আর তার কণ্ঠে জাগে না। বরং চারপাশে সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়া দেখে তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। কবি তাই অরণ্য-কন্যাদের জাগরণ প্রত্যাশা করেন। তিনি চান দিকে দিকে আবার সবুজ বৃক্ষের সমারোহের সৃষ্টি হোক; ফুলে ও ফসলে ভরে উঠুক পৃথিবী; মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পাক বিপন্নতার হাত থেকে।

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কুমিল্লায়। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার মোটেই সুযোগ ছিল না। তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ছোটবেলা থেকেই কবিতাচর্চা শুরু করেছিলেন। কিছুকাল তিনি কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারীকল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কবিতা সহজ, ভাষা সুললিত, ছন্দ ব্যঞ্জনাময়। কবি সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো : 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'মোর যাদুদের সমাধি পরে'। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'একাত্তরের ডাইরি'; শিশুদের জন্য তিনি লিখেছেন 'ইতল বিতল' ও 'নওল কিশোরের দরবারে'।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর কবিপ্রতিভার জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। সেসব হলো : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, একুশে পদক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি পুরস্কার, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। তিনি ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. দূষণমুক্ত প্রকৃতি রক্ষায় পোস্টার প্লাকার্ডসহ র‍্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।

খ. তোমার চারপাশের পরিবেশ, বিশেষ করে গাছপালা রক্ষায় তুমি কী ভূমিকা রাখতে পার সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন রচনা কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মৌসুমে ফুলের গান কার কণ্ঠে আর জাগে না ?
ক. সাধারণ মানুষের খ. সুফিয়া কামালের
গ. অরণ্যের ঘ. পাখির

২. কবি কেন ব্যথিত হন ?
ক. ফুল-ফল না থাকায় খ. মৌসুমি গান শোনায়
গ. অরণ্য-নিধন লক্ষ করে ঘ. বৃক্ষের বহ্নিজ্বালা দেখে

৩. কবি অরণ্য-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন কেন ?
ক. পৃথিবীতে সবুজের বিস্তারের জন্য খ. মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য
গ. ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য ঘ. মৌসুমি ফুল দেখার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছে। এ বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রতিনিয়ত কমছে আবাদি জমি, বন, জঙ্গল। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা—ঘটছে পরিবেশ বিপর্যয়। বিষয়টি উপলব্ধি করে মফিজ খাঁ এবং আমিনা বেগম বৃক্ষমেলা থেকে প্রচুর চারা কিনে এনে এলাকার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেন।

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত বাড়তি জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট সমস্যাটি 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে ?
ক. ফুল-ফলশূন্য পৃথিবী খ. বৃক্ষ-শূন্য পৃথিবী
গ. নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন ঘ. বৃক্ষের সমারোহ সৃষ্টি

৫. এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় যে নির্দেশনা রয়েছে তা হলো—
i. লাগাও গাছ, বাঁচাও দেশ
ii. বৃক্ষ মাটির মুক্তিদাতা
iii. চারিদিকে সবুজের সমারোহ সৃষ্টি হোক

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দোয়েল পাখি বাসা বেঁধেছে জবা গাছে। সোহেল তার নতুন ঘর তোলার জন্য আঙিনার অন্যান্য গাছের সাথে জবা গাছও কেটে ফেলে। দোয়েলের চোখে-মুখে বাসা হারানোর বেদনা। দোয়েল আর গান গায় না। ফুলের সাথে খেলা করে না। অন্যদিকে নিলয় তার বাড়ির আঙিনার খালি জায়গায় ফুল, ফল ও অন্যান্য গাছ লাগায়। গাছগুলোকে সে নিজের মতো ভালোবাসে। তার বাগান দেখে সকলের চোখ জুড়ায়। পাখিরা তার বাগানে চলে আসে। তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন ফলের গাছ থেকে খাদ্য জোগাড় করে, ফুলের সাথে খেলা করে, গান গায়। দিনের শেষে নিশ্চিন্ত মনে বাসায় ফিরে ঘুমায়। নিলয়কে দেখে অনেকেই গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ক. গাছের নতুন পাতাকে কী বলে?
খ. 'বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?
গ. দোয়েলের অভিব্যক্তিতে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের নিলয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

২. সিডরের খবর শুনে তিয়ার ভীষণ মন খারাপ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ ঘর-বাড়ি হারা, খাবার নেই। কী ভীষণ বিপন্ন মানুষ। অথচ এর জন্য মানুষই অনেকটা দায়ী। মানুষ গাছ কেটে বন উজাড় করছে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। এসব দেখে তিয়া অনুভব করে একটা কিছু করবে। সে তার বন্ধুদের নিয়ে বাড়ির খালি আঙ্গিনায়, ছাদে গাছ লাগানোর জন্য মানুষকে সচেতন করে তোলে। তাছাড়া গাছ কেটে বন উজাড় করার বিরুদ্ধে সে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সে ভাবে এই সুন্দর বনই অনেক বেশি ক্ষতির হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। তিয়া স্বপ্ন দেখে ফুলে-ফলে ভরা সতেজ-সবুজ প্রকৃতির।

ক. কবি সুফিয়া কামাল এখন আর কীসের গান শুনতে পান না ?
খ. 'ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?
গ. তিয়ার মন খারাপের বিষয়টির সাথে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন দিকটির মিল খুঁজে পাওয়া যায় ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তিয়া যেন কবির সেই অরণ্য-কন্যা—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

প্রার্থী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক টুকরো রোদ্দুর—
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।

ঘর ছেড়ে আমরা এদিক ওদিকে যাই—
এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই
এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী॥

শব্দার্থ ও টীকা

প্রার্থী — প্রার্থনাকারী। আবেদনকারী।
হিমশীতল — তুষারের মতো ঠাণ্ডা।
স্যাঁতসেঁতে — ভিজে ভিজে ভাবযুক্ত।
অগ্নিপিণ্ড — আগুনের গোলা।
জড়তা — জড়তার ভাব। আড়ষ্টতা।
অকৃপণ — কৃপণ নয় এমন। উদার।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে অবহেলিত, বঞ্চিত ও দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি মমতা সৃষ্টি হবে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন মানুষের দুর্দশায় তারা ব্যথিত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রার্থী' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। আমাদের এই পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য যে তাপ বিকিরণ করে তার সাহায্যেই ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচণ্ড শীতে সূর্যের এই উত্তাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষ। কবি সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা থেকে। অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুর প্রতি তাঁর অসীম মমতা। কবি এই শিশুদের কল্যাণে সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিতে চান। তিনি এমন সমাজ গড়তে চান যাতে বস্ত্রহীন শীতার্ত মানুষের জীবন থেকে সব দুঃখ চিরতরে ঘুচে যায়।

কবি-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় তাঁর মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সন্তান অল্প বয়সেই শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তোলেন। খ্যাতি অর্জন করেন বামপন্থি-বিপ্লবী কবি হিসেবে। বঞ্চনাকাতর মানুষের জীবন-যন্ত্রণার চিত্র যেমন তাঁর কবিতায় অঙ্কিত হয়েছে তেমনি উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সুর। সেকালের দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। আমৃত্যু তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে মানবমুক্তির জয়গান। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থে'র নাম : 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'অভিযান', 'হরতাল' ও 'গীতিগুচ্ছ'। ১৯৪৭ সালের ১৩ই মে মাত্র একুশ বছর বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় এই কবির মৃত্যু ঘটে ।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ধনী-দরিদ্র বিচারে মানুষের মূল্যায়ন হতে পারে না– এই বিষয়ের উপর একটি বির্তক প্রতিযোগিতা আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত অংশগ্রহণে)।

খ. দারিদ্র্য কখনোই মানুষকে মহৎ করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের উচিত কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রম ও মেধা প্রয়োগ করে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। এ বিষয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত অংশগ্রহণে)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান ?

ক. ২১ খ. ২২
গ. ২৩ ঘ. ২৫

২. সকালের এক টুকরো রোদকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে ?

ক. কৃষকের চঞ্চল চোখ খ. এক টুকরো সোনা
গ. এক টুকরো গরম কাপড় ঘ. এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড

৩. সূর্যের কাছে রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটার জন্য উত্তাপ চাওয়ার মধ্যে কবির যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. সহযোগিতা
ii. সহমর্মিতা
iii. সহনশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অর্থাভাবে বিনাচিকিৎসায় মারা যায় লিয়াকতের বাবা। সেই থেকে সে প্রচণ্ড শোক বুকে নিয়ে ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে তিল তিল করে সঞ্চয় করে কিছু টাকা। আর সে টাকা দিয়ে তার গ্রামের বাড়ি বরিশালে গড়ে তোলে একটি হাসপাতাল; যাতে কোনো অসহায়, দুঃস্থ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।

৪. লিয়াকতের কার্যক্রমে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো—

i. মহানুভবতা
ii. মানবতা
iii. মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

৫. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সুকান্তের জলন্ত অগ্নিপিণ্ড হওয়া আর উদ্দীপকে লিয়াকতের শোকগ্রস্ত হওয়া আসলে—

i. আর্ত-মানবতার কল্যাণ করা
ii. কল্যাণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হওয়া
iii. মানুষ মানুষের জন্য—এ সত্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দামি গাড়ি হাঁকিয়ে বারিধারা অফিসে যাবার পথে বিজয় সরণি সিগন্যালে জীর্ণ-শীর্ণ এক ভিক্ষুক নাদিম সাহেবের গাড়ির জানালার পাশে ভিক্ষার থালা বাড়িয়ে দিলে তিনি জানালার কালো গ্লাস তুলে দেন। আর ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন—রাবিশ, ভিক্ষুকে দেশটা ভরে গেছে। কথা শুনে ড্রাইভার আবদুল বলে—স্যার, গরিব মানুষ, কী করবে বলেন? এই ভিক্ষার আয় রোজগার দিয়েই তো ওরা সংসার চালায়।

ক. 'প্রার্থী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত ?
খ. কবি সূর্যকে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলেছেন কেন ?
গ. উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার কোন ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ—বর্ণনা কর।
ঘ. ড্রাইভার আবদুলের অভিব্যক্তিতে 'প্রার্থী' কবিতার মূল চেতনা প্রকাশ পেলেও কবি সুকান্তের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

২. দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি বলে এক বাবু সাব
তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল
এমনি করিয়া কী জগৎ জুড়িয়া
মার খাবে দুর্বল ?

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মসাল কত ?
খ. 'আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব' —বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. কবিতাংশের প্রথম তিন চরণে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটির সাথে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তার বর্ণনা দাও।
ঘ. ভাবের উক্ত বৈসাদৃশ্যকে সাদৃশ্যপূর্ণ করতে 'প্রার্থী' কবিতায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের অভিমত বিশ্লেষণ কর।

একুশের গান

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না, খুন-রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;

পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর-ছেলে বীর-নারী
আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

শব্দার্থ ও টীকা

রক্তে রাঙানো	— আলংকারিক অর্থে বহু মানুষের আত্মোৎসর্গ।
অশ্রু-গড়া	— চোখের পানিতে নির্মিত। এটা কবির কল্পনা।
বসুন্ধরা	— পৃথিবী।
ক্রান্তি	— পরিবর্তন।
লগন	— লগ্ন; ঠিক সময়।
অলকনন্দা	— স্বর্গীয় নদীর ধারা।
ওরা গুলি ছোড়ে	— এখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের বোঝানো হয়েছে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর তারা গুলি ছুড়েছিল।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা-আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ নিয়ে একদিকে গর্ব করতে শিখবে, অন্যদিকে তারা শহিদের রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য সব ধরনের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'একুশের গান' প্রথম ছাপা হয় ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে। এখানে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি ছাত্র-জনতার আত্মোৎসর্গের স্মৃতিতর্পণ করা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের রক্তদান কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। অন্যায়ভাবে গুলিবর্ষণকারী তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির জাগ্রত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে এখানে।

কবি-পরিচিতি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী কথাশিল্পী, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট হিসেবে খ্যাতিমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সমাজমনস্ক লেখক হিসেবে ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২) ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) চলাকালে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ হলো 'ডানপিটে শওকত', 'আঁধার কুঠির ছেলেটি' ইত্যাদি। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কারসহ বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হন।

তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্তমানে প্রবাস-জীবন অতিবাহিত করছেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে তোমার স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কর এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে তোমার অনুভূতি বর্ণনা করে একটা প্রতিবেদন রচনা কর (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে'— এখানে কোন শহিদের কথা বলা হয়েছে?

ক. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের খ. বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের

গ. উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের ঘ. নব্বুইয়ের গণআন্দোলনের

কবিতাংশটি পড়ে ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কেননা
আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে
এখন পশুদের প্রহারের
চিহ্ন;

২. কবিতাংশের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় নিচের কোন লাইনটির?

ক. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি

খ. দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি

গ. দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি

ঘ. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?

৩. কবিতাংশে বর্ণিত পশুরা হচ্ছে 'একুশের গান' কবিতায় বর্ণিত—

i. ওরা এদেশের নয়—চরণের 'ওরা'

ii. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?—চরণের 'তোরা'

iii. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি—চরণের 'তুমি'

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঝড়ের রাত্রে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে
অভিযাত্রিক, নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।
হয়তো বা ভুল, তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ
পথ হারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সন্ধান
অন্য পথের, মুক্ত পথের, সন্ধানী আলো জ্বলে
বিনিদ্র আঁখি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।

২. ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়

ক. 'একুশের গান' কবিতাটি কোন শহিদের স্মরণে লেখা হয়েছে?

খ. 'সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা'—চরণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রথম উদ্দীপকের অভিযাত্রিক-এর সাথে দ্বিতীয় উদ্দীপকের 'ওদের' আচরণের বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর।

ঘ. প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই 'একুশের গান' কবিতার ভাষা-শহিদ—বিশ্লেষণ কর।

কর্ম-অনুশীলন

মুখস্থনির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা এবং তাদের আগ্রহ, কৌতূহল ও ভালো লাগার জগতকে বিকশিত করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন অতীব জরুরি বিষয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ ও নতুন শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে **কর্ম অনুশীলন** অংশে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য কিছু নমুনা কর্মপত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কর্মপত্রের মধ্যে এমনসব কাজের উল্লেখ আছে যার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ রয়েছে; বিনোদনের ভিতর দিয়ে তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ থাকছে এবং বাচনকলা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তাদের সৌন্দর্যবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতাবোধ, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ইত্যাদি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়নের যে দক্ষতাগুলোর সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে পরিচিত হয়েছেন সেই চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা-সমাধান দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা (মৌখিক ও লিখিত), ব্যক্তিক দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা ও সহযোগিতামূলক দক্ষতা বিকাশের নিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করাই এই পর্বের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব দক্ষতার বিকাশ ঘটলে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং পরিবর্তীত বিচিত্র পরিবেশ-পরিস্থিতি সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারবে।

কর্ম অনুশীলন অংশে দেওয়া কর্মপত্রগুলো নমুনা মাত্র। শিক্ষকগণ তাদের বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধাদির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত কাজগুলো করাতে পারেন কিংবা নতুন কোনো কাজও দিতে পারেন। তবে নতুন কোনো কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন : কিছু কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫-৯৬ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথা পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করা হয় নি।

বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কার করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে সফল ও অর্থবহ করার জন্য এসএসসি পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের আলোকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিগত বছরগুলোর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মোট নম্বরের শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্ন স্মৃতিনির্ভর, যা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে উত্তর দেয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ প্রশ্ন অনুধাবন-স্তরের। প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন-দক্ষতা মূল্যায়নের প্রশ্ন খুবই কম। প্রচলিত এ পরীক্ষাপদ্ধতি মূলত শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতাতে মূল্যায়ন করে আসছে।

বস্তুত মুখস্থ, সাজেশন ও নোটনির্ভর এ পরীক্ষাপদ্ধতি শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক বুঝে লেখাপড়ার পরিবর্তে মুখস্থ করার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। আর এ মুখস্থ করাও একটি কঠিন কাজ এবং এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এসব কারণে শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের পাঠলব্ধ জ্ঞান ও অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ এবং উপাত্ত ও ঘটনা বিচার-বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য যাচাই করার মতো ব্যবস্থা প্রশ্নপত্রে থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সৃজনশীল প্রশ্নের অবতারণা।

প্রশ্নপত্রের পরিবর্তন

প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তিন ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন। পরীক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তন করা হয়েছে।

দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑	বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০% নম্বরের পরিবর্তে ৪০% বরাদ্দ থাকবে। তবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান ৩৫%, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০% এবং কৃষিশিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫% নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
❑	বর্তমানে প্রচলিত শুধু সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঙ্গে বহুপদী সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
❑	বহুনির্বাচনি প্রশ্নে চিন্তন-দক্ষতার চারটি স্তরের জ্ঞান বা মনে রাখার জন্য ৪০%, অনুধাবন বা বুঝে লেখার জন্য ৩০%, অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবনকে প্রয়োগ করার জন্য ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতা তথা বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়নের জন্য ১০% প্রশ্ন থাকবে।
❑	শিক্ষাক্রমের সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করা হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন

প্রচলিত ৫০% নম্বরের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০% নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন। তবে ব্যবহারিক পরীক্ষায় আছে এমন বিষয়ে ৪০% সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন হবে মৌলিক অর্থাৎ যা পূর্বে কখনও ব্যবহৃত হয় নি।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন-প্রক্রিয়া

❑	সৃজনশীল প্রশ্ন একটি দৃশ্যকল্প/উদ্দীপক, সূচনা-বক্তব্য (Stem বা Scenario) দিয়ে শুরু হবে।
❑	দৃশ্যকল্প/উদ্দীপকটি কোনো ঘটনা, গল্প, চিত্র, মানচিত্র, গ্রাফ, সারণি, পেপার কাটিং, ছবি, উদ্ধৃতি, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি হতে পারে।
❑	দৃশ্যকল্প হবে মৌলিক। পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি এ দৃশ্যকল্পটি থাকবে না । তবে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্প রচনায় পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করা যাবে।
❑	দৃশ্যকল্পটি শিক্ষাক্রমের/পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে হতে হবে।
❑	দৃশ্যকল্পটি আকর্ষণীয় ও সহজে বোধগম্য হতে হবে।
❑	দৃশ্যকল্পটি সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের অংশগুলো তৈরি হবে এবং প্রতিটি অংশ সহজ থেকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে হবে।
❑	প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন-দক্ষতার চারটি স্তরের (ক-অংশ : জ্ঞান; খ-অংশ : অনুধাবন; গ-অংশ : প্রয়োগ; ঘ-অংশ : উচ্চতর দক্ষতা) সমন্বয়ে গঠিত হবে।
❑	হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের তিন স্তরের (সহজ, মধ্যম ও কঠিন) সমন্বয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন গঠিত হবে।
❑	দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকবে না, তবে উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা থাকবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মোট নম্বর হবে ১০।

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ ও নম্বর বণ্টন

প্রশ্নের অংশ	চিন্তন-দক্ষতার স্তর
ক	**জ্ঞান-দক্ষতা** কোনো ঘটনা, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি স্মরণ করে বা মুখস্থ করে লিখতে পারার দক্ষতাকে জ্ঞানস্তরের দক্ষতা বোঝায়।
খ	**অনুধাবন-দক্ষতা** কোনো অনুচ্ছেদ, কবিতা, প্রবন্ধ, লেখচিত্র ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারা, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা, কোনো কিছু একটি নিয়মে সাজানো, নিয়ম ও বিধি, তথ্য তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি ইত্যাদি পাঠ্য বই হতে হুবহু মুখস্থ না করে বুঝে নিজের ভাষায় উত্তর করার দক্ষতাকে অনুধাবন স্তরের দক্ষতা বলে।
গ	**প্রয়োগ-দক্ষতা** এটি হলো কোনো অর্জিত জ্ঞান এবং অনুধাবন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা। সূত্র, নিয়ম-বিধি ইত্যাদি প্রয়োগ করে নতুন পরিস্থিতিতে কোনো প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতাকে
ঘ	**উচ্চতর দক্ষতা** কোনো বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশোধন (সাধারণ থেকে বিশেষ) ও মূল্যায়ন করার দক্ষতা হলো উচ্চতর দক্ষতা। আন্তঃসম্পর্ক, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় , তুলনা করা, পার্থক্য করা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তৈরি করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া , কোনো সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা, মতামত প্রদান, প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি উচ্চতর স্তরের দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।

সমাপ্ত